খোলা জানালা

সাধু যোসেফকে নিয়ে আমাদের পরিবারের যাত্রা

সিস্টার মেরী অমিয়া গমেজ এসএমআরএ

যিশুর আদর্শ, ধার্মিক, ঈশ্বর ভীরু, ধর্মনিষ্ঠ, স্নেহাশীল পালক পিতা ও কুমারী মারীয়ার অতি বিশ্বস্ত স্বামী বিশুদ্ধ নীরব কর্মী সাধু যোসেফ কাজ করতে করতে মনের অজান্তে জনসমক্ষের সামনে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। মানব সমাজে কেহ তাঁকে খোঁজে নেননি, পাত্তাও দেননি, তিনিও সামাজিক কোন কর্মকাণ্ডে নিজেকে জাহির করেননি। এ ঘুমন্তকে জনসমক্ষে জাগরিত করে তুলেন পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রৈরিতিক পত্র Patris Corde এর মাধ্যমে। তিনি আমাদের সাধু যোসেফ সম্পর্কে সচেতন করে তুলেন যেন তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করি এবং তাঁর মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি। এ জন্য গত ৮ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বর্ষকে সাধু যোসেফের বর্ষ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। কাথলিক মণ্ডলী পোপের বাণীকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। আসলে আমরাই সাধু যোসেফ সম্বন্ধে ঘুমন্ত ছিলাম। খুব একটা ডাকিনি, তাঁর কাছে বেশি যাইনি বা তাঁকে গুরুত্ব দেইনি। তবে এ কথাটি একেবারেই যে সত্য তা নহে, অনেক মানুষই সাধু যোসেফ ভক্ত ছিলেন এখনো আছেন। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের দেওয়া চেতনাবোধ এ বছর থেকে এখন সবার মধ্যেই জাগরিত হয়েছে। গত একটি বৎসর কত আনন্দ সহকারে সাধু যোসেফের সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শণ করা হয়েছে। নিজ ধর্মপল্লীতে কত আড়ম্বর পূর্ণবাবে পর্ব উদ্‌যাপন করেছেন। এ সাধুর নামধারী ব্যক্তির স্মরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে, বিভিন্ন স্থানে তাঁর নাম উৎসর্গীকৃত গির্জা, চ্যাপেল, কারিগরি একাডেমিক স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ডিসপেনসারী সন্ন্যাস সংঘ, ভ্রাতৃসংঘ, কনভেন্ট, বাড়ি, পাড়া, সংঘ সমিতি, সংস্থাসমূহ কত আনন্দ সহকারে ও যত্নের সাথে সাধু যোসেফকে স্মরণ করে সময় বিশেষে জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠানাদি করা হয়েছে। আর আমরা বুঝতে পারি এতে সাধু যোসেফ খুবই সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। স্বর্গে যিশু ও মা মারীয়ার পরই সাধু যোসেফের স্থান। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য এ পার্থিব জগৎ সংসারে পালক পিতা হিসাবে সাধু যোসেফকে আলাদাভাবে পবিত্র, নির্মল, বিশুদ্ধ ঈশ্বরের পথে চলে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি যিশুর পালক পিতা ও কুমারী মারীয়ার স্বামী হিসাবে ব্যক্তি জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া গুনগুলো অতি যত্নে লালন পালন ও চর্চা করেছেন একমাত্র মারীয়াকে শুচি, বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য এবং যিশুকে পিতৃ স্নেহে একজন স্নেহশীল ও আদর্শ পিতা হিসাবে ও জগতে আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক, মানবিক, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি সব বিষয়েই খুব সুন্দর শিক্ষা ও গঠন দিয়েছেন। যিশুর জন্মের পর থেকেই আমরা প্রায়ই যিশু মারীয়া ও যোসেফকে ছবিতে বা মূর্তিতে দেখতে পাই এ অবস্থাকে বলি পবিত্র পরিবার। নাজারেথের পবিত্র ও আদর্শে পরিবার। পরিবার কেবল নাজারেথের নয় সমগ্র বিশ্বে পরিবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমরা কাথলিক মণ্ডলীতেও নাজারেথের পবিত্র ও আদর্শ পরিবারের সৌন্দর্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখি এবং তাঁদের অনুকরণে আমরাও সেভাবে পবিত্র ও আদর্শ পরিবার গঠন করার চেষ্টা করি। সাধু যোসেফ এ পরিবারের কর্তা রক্ষক, পালনকারী, পরিচালক, সাহায্যকারী, বন্ধু, শিক্ষক, উপার্জনশীল ব্যক্তি, কঠোর পরিশ্রমী, ঈশ্বর বিশ্বাসী, এক নিষ্ঠ ঈশ্বর ভক্ত, বিশ্বস্ত, সংযমী, কর্তব্য পরায়ণ, সৎ, ত্যাগী, দায়িত্বশীল, বাধ্য, বিনয়ী, আনন্দদানকারী, উদার, দানশীল, সহজ ও সরল, সময় বিশেষে উদ্বিগ্ন (যিশু মন্দিরে হারিয়ে যান ব্যাকুল চিত্তে খুঁজেন) একজন হৃদয়বান ও ভালবাসার মানুষ। আমাদের পরিবার গুলোতে সাধু যোসেফের গুণগুলো অনুসরণ করতে পারি। এগুণ আমাদের মধ্যে কিছু অর্জন করে আমাদের পরিবারগুলো পরিচালনা দান করতে পারি। সর্বোপরি ঈশ্বরের সাহায্য ও আশীর্বাদ লাভ করতে যিশু মারীয়া যোসেফের কাছে প্রার্থনা করতে পরি। সাধু যোসেফ পরিবারের কর্তা ও ভাল মৃত্যুর প্রতিপালক তাই ভাল মৃত্যুর জন্য তাঁর কাছে আমরা প্রার্থনা ও সাহায্য যাচ্‌না করতে পারি। সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা, সম্মান দেখানো এবং ভালবাসার বিশেষ ভাবে ভাল মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করার প্রেরণা আমি লাভ করেছি আমার পরিবার থেকে। বিশেষভাবে আমার বাবা যিনি সাধু যোসেফ ভক্ত ছিলেন তার কাছ থেকে। আমাদের ঘরে আলতারে রাখতে বাবা কলকাতা থেকে যিশু, মা মারীয়া সাধু যোসেফ (যিশু কোলে), সাধু আন্তনী, ফাতেমা রাণী, লূর্দের রাণীর মূর্তি এনেছেন। এসব মূর্তিদেখেও আমাদের ধর্মভক্তি বেড়েছে প্রার্থনা করার অনুরাগ এসেছে। পবিত্র পরিবার ও আদর্শ পরিবার করার জন্য যিশু হৃদয়ের সিংহাসন করা হয়েছে। আমার বাবা কলকাতায় বাবুর্চি কাজ করতেন এবং মুসলিম পাড়ায় অন্যান্য খ্রিস্টান ভাইদের সাথে থাকতেন। (বর্তমানে মেস বলে পরিচিত) তাই সেখানে সম্মিলিত একটি দল ছিল এবং তারা একটি সমাজ গঠন করেছেন নাম সাধু যোসেফের সমাজ। এ সমাজভুক্ত সকলের পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। দেশে গ্রামে সমাজ গঠন করেন তার নামও সাধ যোসেফের সমাজ (তুইতাল ধর্মপল্লী পুরান তুইতাল গ্রাম) বাড়ীতে আসলে এখানেও তিনি সাধু যোসেফের সমাজ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কলকাতায় সাধু যোসেফের সমাজের সদস্যদের প্রার্থনা করার এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেন তৎকালীন মুরগী হাঁটা মোলানী গির্জার যাজকগণ। এদের মধ্যে বাবার মুখে যাদের নাম শুনেছি তারা হলেন ফাদার হেনরী ও ফদার ডনটন। শেষোক্ত যাজকের পুরো নাম জানিনা তবুও আমরাও শুনে শুনে অভ্যস্থ হয়েছি। যাজকেরা সময় করে সন্ধ্যাবেলা বাবুর্চিরা যখন (অন্যান্য কর্মীজীবিরা) ঘরে থাকতেন তখন এসে দল নিয়ে প্রার্থনা করতেন। সেই সময় যারা মুকলিশ পাড়ায় থেকেছেন তারা প্রায় সবাই ধর্মপ্রাণ হয়ে উঠেছেন, প্রার্থনার প্রতি সাধু যোসেফের প্রতি ভক্তি বেড়েছে এবং ফাদারগণ অন্যান্য ধর্ম, রীতিনীতিও শিক্ষা

দিতেন। তারা যখন নিজ বাড়ীতে আসতেন তখন তারাও পরিবারে একত্রে প্রার্থনা করতেন ফলে পরিবারগুলো ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠে। আমার বাবা সন্ধ্যাবেলা গান শেখাতেন। আমরা পরিবারে তিনভাই ও তিন বোন থাকা সত্ত্বেও আমার বাবা আরও একজন পুত্র সন্তান পাওয়ার আশা করেন। তাই তিনি সাধু যোসেফের কাছে খুব বিশ্বসপূর্বক আশা নিয়ে এক পুত্র সন্তানের জন্য খুব জোর দিয়ে প্রার্থনা করেন। যদি ছেলে হয় তবে তার নাম রাখা হবে যোসেফ। সত্যিই সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় ঈশ্বর তার প্রার্থনা শুনেছেন এবং এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। বাবা তার এ সন্তানের নাম রাখেন যোসেফ। তিনি খুব খুশী হয়ে ঈশ্বর ও সাধু যোসেফকে ধন্যবাদ দেন। এ ভাইটি আমার আট বৎসরের ছোট এবং আমাদের সবার ছোট। সাধু যোসেফ বর্ষে তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের বাড়ীর আর একটি কথা বলছি। আমাদের বাড়ীতে আগে বন্যার সময় পানি উঠত তবে থাকার অযোগ্য হত না, কিন্তু ১৯৫৪-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ বন্যায় যে পরিমাণে পানি হয়েছে যে বাড়ী থেকে ২ বৎসরেই সরে অন্যত্র যেতে হয়েছে। এর পরবর্তী বৎসরে মাটি দিয়ে বাড়ী অনেক উচুঁ করা হয়। এরপর আর বাড়ীতে পানি উঠেনি। মাটি উঠানোর সময় আমার যোসেফ-বিশ্বাসী ছোট দাদা একটি যিশু মারীয়ার যোসেফের (পবিত্র পরিবার) দস্তার গোল বড় একটি মেডেল বাড়ীর সামনে পুঁতে দেয়। তার বিশ্বাস সাধু যোসেফ আমাদের বাড়ী নানা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন। সত্যিই সাধু যোসেফের কাছ থেকে আমরা বহু আশীর্বাদ, দয়া ও নিরাপত্তা পাচ্ছি। সাধু যোসেফের বর্ষে তাঁকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। সাধু যোসেফের প্রতি নির্ভরশীল ও ভক্তি-পরায়ণ কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় অনেক আশ্চর্য কাজের ফল লাভ করেছেন। সে সমস্ত বইয়ে, পত্র পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। আমার বড়দিদি সিস্টার মার্গারেট মেরী এমসি যিনি মাদার তেরেজার সমাজে প্রথম দলের ১২ জনের ১ জন তার সুখে এ সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা অনেক শুনেছি। মা তেরেজার সাধু যোসেফের উপর অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি, নির্ভরশীলতা ও ভালবাসা ছিল। এখন আমি একটি বাস্তব ঘটনা যা নিজের চোখে দেখেছি তাই পাঠক বর্গের সাথে সাধু যোসেফের বর্ষে সহভাগিতা করতে যাচ্ছি।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ আমার বয়স ১১ বছর হবে। মায়ের সাথে ২ বোন ও ছোট ভাই যোসেফ (মাদার তেরেজার দেওয়া নাম-নির্মল যা "নির্মল হৃদয়" মুমূর্ষুদের হাসপাতালের নামানুসারে রেখেছেন) বয়স ৪ বৎসর আমরা সবাই মিলে কলকাতা গিয়েছি আমার সিস্টার দিদিকে দেখতে। অক্টোবর মাস এবং সেখানে পূজার আনন্দ চারিদিকে। আমরা মাদার তেরেজার হাউজে সকাল অথবা বিকেল বেলা দিয়ে দীর্ঘ সময় দিদির সাথে সময় কাটাতাম। আমরা সেখানে ২০ দিনের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই মাদার তেরেজার সাথে দেখা পেয়েছি। মাদার তেরেজা সকালে বাইরে যাওয়ার সময় পার্লারে ঢুকে আমাদের চিবুক ধরে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন। একদিন দিদি বললেন সকালে গ্রটোর প্রার্থনার পর যখন সবাই যার যার কাজে যাবেন তখন মাদারের কাপড় ধরে ২/৩ জন সিস্টার বললেন, মাদার আপনি যে বাইরে যাচ্ছেন এসে খাবেন কি, আজ কোন খাবার নেই ঘরে। মা বলে গেছেন আট আনা পয়সা একটি টুকরা সাদা কাপড়ে বেঁধে সাধু যোসেফের পায়ের নীচে রেখে প্রার্থনা করতে যেন তিনি খাবারের যোগান দেন, দিদি বললেন আমরা তাই করেছি। আমরা দেখলাম মাদার বাইরে যাওয়ার ২-৩ ঘন্টার মধ্যে বড় গেটের সামনে বড় বড় ২ ট্রাক এসে হাজির তাতে আছে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, দুধ, চাপাতা, ঘি, তেল ইত্যাদি। বড় বড় মারোয়ারী ব্যবসায়ীরা কাগজপত্র নিয়ে (লিস্ট) পার্লারের সামনে ছোট গেট দিয়ে ঢুকে আমার দিদিকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করছেন এটা মাদার তেরেজার বাড়ী কিনা। দিদি সম্মতি সূচক উত্তর দিলেন। আমরা তিন ভাই বোন কৌতুহলী হয়ে অবাক হয়ে দেখছি কি ঘটনা ঘটে। দিদি সব বুঝেছেন কি হচ্ছে। তিনি অন্যান্য সিস্টারদের ডেকে আনলেন এবং জিনিসের লিস্টে যে সব দ্রব্যাদি আছে মারোয়ারীদের কর্মচারীরা মাথায় করে ভিতরে গুদামে সাজিয়ে দিচ্ছে এবং সব মাল মিলিয়ে কাগজে ভারপ্রাপ্ত একজন সিস্টারের স্বাক্ষর নিয়ে চলে গেলেন। এ সব কাণ্ড দেখে আমরা অবাক। সিস্টারগণ কেবল ধন্যবাদ দিয়ে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন।

আমার দিদি বললেন, মাদার বাইরে গিয়ে নিশ্চয় ব্যবসায়ীদের কাছে জিনিস কিনতে গেছেন বা সাহায্য চেয়েছেন আর প্রায়ই এরূপ ঘটনা ঘটে যা আমরা চিন্তা করতে পারি না। আর একদিন দেখলাম মাদারের বাইরে যাওয়ার প্রায় ৩ ঘন্টার মধ্যে কয়লা বোঝাই ট্রাক এসে হাজির। এসব বাস্তব ঘটনা আমি দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখেছি তাই বলত সাহস পেলাম। সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করে কিছু পেলে মাদার সিস্টারদের মজা করে বলতেন দেখেন আমি কেমন ম্যাজিক জানি। ঈশ্বরের উপর সাধু যোসেফের উপর নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হয়ে মা তেরেজা জীবন যাপন করেছেন। সাধু যোসেফের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি আছে?

গত একটি বছরে আমরা সাধু যোসেফ সম্পর্কে অনেক জেনেছি, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছি, তাঁর অনেক গুণের কথা শুনেছি, সর্বোপরি তাঁর সাথে আমাদের আত্মিকভাবে পরিচয় ঘটেছে। যিশুর পালক পিতা হিসাবে তাঁর অনেক কিছু করার ক্ষমতা আছে যা আমাদের কাছে অজানা ছিল। তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁর ধার্মিকতা, ধর্মনিষ্ঠা, নীরব কর্মী ও কঠোর পরিশ্রম হিসাবে দারিদ্রের জীবন যাপন করে যিশু ও মারীয়ার প্রতি পরিবারের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে তিনি সাধারণ মানুষ হয়েও অসাধারণভাবে চলে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অতি নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন।

আমরাও যেন সাধু যোসেফের মত সুন্দর আদর্শ দাম্পত্য জীবন যাপন করে নিজেরা সুখী ও আনন্দিত থাকতে পারি। পাড়া প্রতিবেশিদের সাথে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণভাবে আনন্দে দিন কাটাতে পারি এবং পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের কথামত চলে বাকী জীবন সার্থক করে তুলতে পারি। সর্বোপরি সাধু যোসেফের মত পবিত্র সহজসরল জীবন যাপন করে সুখের পথে স্বর্গের পথে চলে ভাল মৃত্যু লাভ করতে পারি এই আশীর্বাদ ও সাহায্য যাচ্না করি॥ ৯০

খোলা জানালা

কাথলিক মণ্ডলী: মিলন, ঐক্য ও ভালবাসার সমাজ (Synodal Church and Synodality)

ফাদার আলবাট রোজারিও

ভূমিকা : গত ২২ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আর্চবিশপ বিজয়ের আমন্ত্রণে রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রালে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে রোম নগরীতে যে বিশপ মহাসভা (সিনড্) হবে তার প্রাথমিক সভা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশপ,ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার ও নেতৃস্থানীয় খ্রিষ্টভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। সেদিন থেকেই সহজ-সরল ভাষায় এ বিষয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা মনে ছিল। বিভিন্ন জনের বক্তব্য ও লেখা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু লিখছি। অর্থাৎ আমার ব্যক্তিগত চিন্তা, নিদিষ্ট কিছু লোকের সাথে আলাপ-আলোচনা, ফেস বুকে ফাদার মাইকেল দৈউরীর এ বিষয়ে বক্তব্য, পোপ মহোদয়ের বিভিন্ন লেখা ও পত্র ইত্যাদি পড়াশুনা করে মণ্ডলী সম্পর্কে আমার যে চিন্তা-চেতনা, যে ধারণার জন্ম হয়েছে তা-ই আপনাদের সাথে একটু সহভাগিতা করছি। গত ১০ অক্টোবর, রোববার, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীতে স্থানীয়ভাবে সিনড্-এর দুই বৎসরের প্রক্রিয়াগত প্রস্তুতি শুরু করার আহ্বান জানান। যার অর্থ পুরো কাথলিক বিশ্বের সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশপগণ তার ধর্মপ্রদেশের সকলের সাথে কাউকে বাদ না দিয়ে যেন এক সঙ্গে বসেন, এ বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। পোপের এই আহ্বানের পর পরই বর্তমান মাণ্ডলিক জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সবাই আলোচনা করছে, আলোচনা হচ্ছে। সবাই ভাবছে। পোপ মহোদয় যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন, ঘোষণা করেছেন সেভাবেই সব কিছু হচ্ছে। পোপ মহোদয়ের ঘোষণার একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সেটা হলো সিনড্াল ও সিনড্ালিটি অব দা চার্চ। যার অর্থ হচ্ছে মাণ্ডলিক জীবন ধারা, অর্থাৎ মাণ্ডলিক জীবনের অবস্থা, মাণ্ডলিক জীবনের কার্যক্রম। বিশেষ করে মাণ্ডলিক জীবনে মঙ্গলসমাচারের কার্যক্রম কিভাবে চলছে সেটা একটু ভেবে দেখা। সিনড্ালিটি অব দা চার্চ অর্থ– মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব। দয়াময় ঈশ্বর এই মুহূর্তে আশা করেন আমরা যেন একটি মিলন সমাজ হয়ে উঠি।

সিনড্ এবং সিনড্ালিটি

২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর রোম নগরীতে যখন বিশপগণের সিনড্ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করা হয় তখন পুণ্যপিতা পোপ সিনড্ এবং সিনড্ালিটি বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। পঞ্চাশ বর্ষপূর্তির বিশপগণের সেই সিনড্ ছিল "পরিবারের" উপর। পুণ্য পিতা পোপ বলেন, সিনড্ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা থেকে প্রাপ্ত বহুমূল্যবান সম্পদ। সিনড্াল মণ্ডলী হলো এমন মণ্ডলী যে মণ্ডলী মানিয়ে (listening) নেয় বা গ্রহণ করে এবং অনুভব করে যে মানিয়ে নেওয়া শুধুমাত্র

শুনার (hearing) চেয়ে আরোও বেশি গভীর ও অর্থপূর্ণ। এটা হলো পারস্পরকে শ্রবণ করা যেখানে শেখার ও জানার অনেক কিছু আছে। ভক্ত জনসাধারণ, বিশপ সম্মিলনী, রোমের বিশপ সকলেই পরস্পরকে শ্রবণ করে, পবিত্র আত্মাকে, সত্যের আত্মাকে শুনে। যাতে বুঝতে পারে সে মণ্ডলীকে কি বলতে চায়।

সিনড্াল বা সিনড্ালিটি শব্দের অর্থ

সিনড্াল বা সিনড্ালিটি শব্দটির অর্থ কি? এই শব্দটি দু'টি গ্রীক শব্দের মিলন বা সংমিশ্রণ। প্রথমটি হচ্ছে 'সান' যার অর্থ হচ্ছে 'সঙ্গে থাকা'। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'এড্োস' যার অর্থ হচ্ছে 'পথ'। তাই সিনড্াল বা সিনড্ালিটি অর্থ হচ্ছে এক সঙ্গে পথ চলা। একটি সিনড্াল মণ্ডলী অর্থ হচ্ছে এমন মণ্ডলী যে মণ্ডলীতে আমরা প্রত্যেকজন পোপ, বিশপগণ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগন এবং সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ, নারী-পুরুষ সমগ্র মাণ্ডলিক জীবনে এবং প্রেরণকাজে একসাথে পথ চলি। অর্থাৎ মিশনারী তীর্থযাত্রা। অন্যের সঙ্গে যাত্রা করা।

পোপ মহোদয় আমাদের সবাইকে একটা চেতনা দিচ্ছেন, একটা প্রেরণা দিচ্ছেন যে মণ্ডলীকে কি ধরণের মণ্ডলী হওয়া দরকার। কেমন মণ্ডলী হওয়া দরকার। এই মণ্ডলী হলো– আমরা একসাথে পথ চলব, সবার কাছে যাব, সবার অংশগ্রহণ হবে, একটা মিলন হবে, আমরা মিশনারী মণ্ডলী হব। এখানে থাকবে সবার আন্তরিক অংশগ্রহণ।

বাইবেলের শিক্ষা

সিনড্াল মণ্ডলীর বিষয়ে বাইবেলে খুবই পরিষ্কারভাবে বলা আছে। যিশু স্বর্গে যাবার আগে শিষ্যদের একটি দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারের ২৮:১৯ পদে আছে, তোমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে যাও, ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত কর। মার্কের মঙ্গলসমাচারের ১৬:১৬ পদে আরো সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে,সমগ্র জগতে যাও, বিশ্ব সৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। 'সমগ্র' শব্দটির মধ্যে একটা গভীর অর্থ নিহিত আছে। সমগ্র বলতে শুধুমাত্র মানুষ না, সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র রীতিনীতি, সমগ্র কৃষ্টির কাছে এই মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করতে হবে। লূকের লেখা মঙ্গলসমাচারের ১০:১-২৪ পদে আছে যিশু দু'জন দু'জন করে

তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন, মানুষকে সুস্থ করেছেন, মানুষের কাছে গিয়েছেন, তারা এক একটা শুভ বার্তা প্রচার করেছেন।

যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচারে ১৪:৬ পদে আমরা পাই, আমি পথ, আমি সত্য, আমি জীবন। তাই আমরা যারা যিশুকে ভালবাসি, আমরা যারা যিশুর নামে বিশ্বাসী সমাজ হয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছি আমাদের দায়িত্ব হলো মিলনের জন্য, মিলন করানোর জন্য। আমাদের দায়িত্ব হলো অংশগ্রহণ করার এবং অন্যেরা যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা এবং সেভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এভাবে এগিয়ে গিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজগুলো আমরা করতে পারি। আর সেটাই আমাদের প্রেরণ দায়িত্ব। সাধু পলের লেখা রোমীয়দের কাছে পত্রের ৬:৬-৮ পদে বলা হয়েছে, বিভিন্ন জন পবিত্র আত্মার দানে ভূষিত হয়ে বিভিন্ন সেবাকাজের দায়িত্ব পেয়েছেন। যে কারণে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন সেবা কাজ করে থাকি। কিন্তু এই সেবাকাজের প্রেরণা যার কাছ থেকে আসে তিনি স্বয়ং খ্রিস্ট। যেখানে খ্রিস্ট সেখানেই ঈশ্বর পিতা ও পবিত্র আত্মা নিহিত আছেন।

এক সঙ্গে আসা, পথ চলা ও কাজে অংশগ্রহণ করা

পোপ মহোদয় বলেছেন, সব কাজে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সমস্ত কৃষ্টি, সমস্ত সৃষ্টির মানুষকে একত্রিত করতে হবে। পঞ্চাশত্তমী পর্ব দিবসে মঙ্গলসমাচার প্রচার বিষয়ে সাধু পিতরের ঘোষণা আমরা পাই প্রেরিতদের কার্যাবলী গ্রন্থের ২:১-১২ পদে। এখানে কিন্তু অনেক ভাষাভাষি, অনেক গোষ্ঠীর মানুষ ছিল। এবং তাঁর সেই উপদেশ বাণীতে বিশ্বাসী হয়ে আমরা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছি। পোপ মহোদয় আমাদের কাছে আশা করেন আমরা যেন একসঙ্গে থাকি ও পথ চলি। তাঁর দ্বারা লিখিত পত্রগুলোতে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা আছে। 'হোক তাঁর প্রশংসা' বা 'লাউদাতো সি' পত্রের ১৩ নম্বরে দেখি যেখানে পোপ বলেছেন, এই পৃথিবী হচ্ছে আমাদের সবার বাড়ি। ওয়ান হোম। আমাদের এই বাড়ীকে রক্ষা করতে হবে। যাতে আমরা সেখানে নিরাপদে বসবাস করতে পারি। একই পত্রের ২৭ নম্বরে তিনি বলেছেন, আমার একটি স্বপ্ন আছে যেখানে মণ্ডলীতে সবাই, সমস্ত ভাষাভাষি, কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষ এমনই একটা চ্যানেল, এমনই একটি পথ হয়ে উঠবে যারা সমস্ত বিশ্বের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করবে। বিষয়টি যে পুরাতন বা নতুন কিছু তা কিন্তু নয়। এটা যিশুর নির্দেশনাকে, যিশুর দাবীকে পোপ মহোদয় আবার নতুন করে, নতুন রূপে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তাই এটা আমাদের দায়িত্ব, এটা আমাদের কর্তব্য যে আমরা সবাই এক সঙ্গে পথ চলব। আমরা মিলন করব, মিলন ঘটাব, সেটা আমাদের দায়িত্ব।

মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য: এক, পবিত্র, সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক

বড়দিন উৎসবে আমরা বলি ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন। মানুষ হয়ে ঈশ্বর যখন জগতে প্রবেশ করেছেন, যখন জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সেখানে প্রবেশ করেছেন যেখানে শুধু মানুষ ছিল না, সেখানে সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত পশু-পাখী ছিল। স্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টির মাঝে প্রবেশ করেছেন। এটা হলো ঈশ্বরে-মানুষে, মানুষে-মানুষের সাথে সৃষ্টির মিলন, একটা সম্পর্ক। আমাদেরকে বলা হয় কাথলিক মণ্ডলী। কাথলিক শব্দের অর্থ সার্বজনীন। তাই মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হলো মণ্ডলী এক, মণ্ডলী পবিত্র, মণ্ডলী সার্বজনীন, মণ্ডলী প্রৈরিতিক। অন্যের কাছে আমাদের প্রকাশ করতে হবে যে আমরা এক, আমাদের মিলন আছে।

আর আমরা সার্বজনীন বলেই আমাদের সবার কাছে, সমস্ত কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ভাষাভাষি মানুষের কাছে যেতে হবে। এটা যিশুর দেওয়া নির্দেশনা। যিশুর প্রতি আমাদের দায়িত্ব। আমরা প্রায়ই বলে থাকি– এটা আমার দায়িত্ব না, এটা আমার কাজ না, মঙ্গলসমাচার প্রচারের দায়িত্ব ঐ সম্প্রদায়ের, ঐ ব্যক্তির, ঐ সমাজের। আমাকেতো দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। একজন খ্রিস্টান হিসেবে, দীক্ষাস্নাত মানুষ হিসেবে আমরা একথা বলতে পারি না। এটা বলা যায় না। এটা শোভা পায় না। এটা আমাদের দায়িত্ব। কারণ মণ্ডলী সার্বজনীন। আমরা যদি যিশুকে ভালবাসি, তাঁকে বিশ্বাস করি, তবে তাঁর নির্দেশনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নিজে অংশগ্রহণ করতে হয়, অন্যকেও অংশগ্রহণ করাতে হয়।

সিনড্যালিটি : একটি নতুন পথ

আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মণ্ডলীর প্রয়োজন আছে সমাজের দিকে নতুনভাবে তাকানো। সমসাময়িক বিষয়গুলো মণ্ডলীকে ভালোমত জানতে হবে। মণ্ডলীর অন্তর দৃষ্টি খোলা রাখতে হবে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নেতিবাচক দিকগুলো রয়েছে সেখানে মণ্ডলীকে প্রাবক্তিক ভূমিকা রাখতে হবে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার (১৯৬২-১৯৬৫) মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর কাঠামোতে এবং মাণ্ডলিক আইনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় মণ্ডলী ও স্থানীয় মণ্ডলীর বিশপদেরকে আরো গুরুত্ব দেওয়া ও শক্তিশালী করা। পরস্পরের মধ্যে যেন সহযোগিতা থাকে। বিশপ সম্মিলনি যার প্রধান হলেন পোপ দায়িত্ব হলো পুরো মণ্ডলীটাকে পরিচালনা করা। এজন্যেই সিনড্ বা বিশপ সভা করা হয়েছে যারা নিয়মিত পোপের নেতৃত্বে বসে থাকেন এবং মণ্ডলীর সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

শেষ কথা

পোপ মহোদয় আমাদের অনুপ্রেরণা দেন, যিশু যে জীবন আমাদের দান করেছেন তা যেন আমরা হারিয়ে না ফেলি বরং সেই জীবনটাকে যেন আমরা আরো ভাল করে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের নিজেদেরই যদি এই জীবন না থাকে তাহলে অন্যকে তা কি করে দেব? পোপ মহোদয় চান যেন আমরা অন্যের সাথে পথ চলি, মিলন ঘটাই। আমাদের নিজেদের অংশগ্রহণ করতে হবে এবং একই সাথে অন্যের অংশগ্রহণও আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। অমাদেরকে হতে হবে প্রেরিত– প্রথমে প্রেরিত হতে হবে আমি আমার মধ্যে। আমি কতটুকু যিশুকে, যিশুর মঙ্গলসমাচারে, মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে বিশ্বাস করি ও জীবনযাপন করি? আমি কতটুকু অন্যকে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করি? অন্যকে প্রেরণ করার জন্য আমি কতটুকু তাগিদ অনুভব করি?

সিনড্যাল চার্চ মানে– মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ দায়িত্ব পালন। এটাই মণ্ডলীর প্রবাহমান যাত্রা। কারণ দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলে স্পষ্টত: উল্লেখ আছে যে মণ্ডলী নিজেই বৈশিষ্ট্যগতভাবে প্রৈরিতিক। তাই আমাদের সবার দায়িত্ব বা উচিৎ হবে পোপ মহোদয়ের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া যেন আমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারি। আমরা যেন একে অন্যের সঙ্গী হতে পারি, পথ চলতে পারি, আমাদের গুণাবলী ও কাজ সহভাগিতা করতে পারি এবং সবাই মিলে বিশ্ব সৃষ্টির কাছে মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করবে পারি।

যিশু আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন তাঁর সঙ্গে এবং সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে থাকার জন্যে। পবিত্র ত্রিত্বের প্রতিকৃতিতে আমাদের এই মিলন। মিলনের জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করতে হয়। প্রথমত: নম্র হওয়া, নীচে নামা। যিশু নবাব থাকেন নি। পিতার বাধ্য ও পিতার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। আমরা সবাই যেন মিলে-মিশে থাকতে পারি– ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন॥

খোলা জানালা

মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়

আগষ্টিন সুবাস পিউরীফিকেশন

ভূমিকা

সময়ের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। পৃথিবীর সব দেশেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি তো মানুষের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও এই উন্নয়নধারায় সামিল হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়েছে। মানুষের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয় ও শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আগে যেখানে হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এখন সেখানে সরকারী-বেসরকারী মিলিয়ে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। দুই-তিন দশক আগে রাজধানী ঢাকায় সুউচ্চ ভবন ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। এখন সেখানে অসংখ্য সুউচ্চ ও সুদৃশ্য ভবন হয়েছে। এসব উন্নয়নের সাথে সাথে একদিকে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অর্থলিপ্সা, ভোগ-বিলাস ও তথাকথিত আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বেড়ে চলেছে লক্ষ্যণীয়ভাবে, অন্যদিকে মানুষের মানবিক মূল্যবোধগুলো ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সমাজে দেখা দিচ্ছে এক ধরনের অস্থিরতা, বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, খুন-খারাবি, নানা ধরনের অন্যায্য ও অনৈতিক কার্যকলাপ। সমাজ সচেতন ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ মনে করেন, এসবের মূল কারণ মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয়। সমস্ত উন্নয়নই এক সময় অর্থহীন হয়ে পড়বে যদি না মূল্যবোধের এই অবক্ষয় ঠেকানো যায়।

মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়

মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির অন্তর্গত কিছু বিশ্বাস বা নীতিমালা যা তার ভেতর থেকে আসে। ব্যক্তির অভ্যন্তরের বিশ্বাসপ্রসূত এই মানদন্ড বা নীতিমালার আলোকে সে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে ও প্রাত্যহিক জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মূলত মূল্যবোধ হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি। এজন্য মূল্যবোধকে বলা হয় 'হৃদয়ের ডাক'। মূল্যবোধগুলোর মধ্যে রয়েছে সততা, সাহসিকতা, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, দেশপ্রেম, সম্মান, সমবেদনা ইত্যাদি। এগুলো বহির্জগত তথা সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম বা রাষ্ট্র দ্বারা নির্দেশিত বাধ্যতামূলক কোন আচরণবিধি নয় যা তাকে মেনে চলতে হয়। এগুলো তার অন্তস্থিত নিজস্ব মানদন্ড যা তার কাজ ও আচরণে প্রতিফলিত হয় এবং তার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। একজন মানুষ নিজেই ঠিক করে নেয় কোন মূল্যবোধগুলো সে অনুসরণ করবে। এজন্য একজনের জন্য যে মূল্যবোধগুলো গ্রহণীয় ও পালনীয়, অন্যজনের জন্য তা নাও হতে পারে।

মূল্যবোধের গুরুত্ব

প্রত্যেক মানুষের জন্যই মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যবোধ তাকে গড়ে তোলে, তার বিকাশ সাধনে সহায়তা করে, তার ব্যক্তিত্বকে সুশোভিত ও মাধুর্যমন্ডিত করে। মূল্যবোধ তার জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান ক'রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার চিন্তা, কথা ও কাজকে প্রভাবিত করে এবং তাকে মানবিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সঠিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর কর্মের মাধ্যমে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে উঠেন। মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ অনেক সময় হয়তো সমাজে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না, তবে তাঁর কাজ ও আদর্শ দিয়ে মানুষের হৃদয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনটি ঠিকই দখল করে রাখেন।

ব্যক্তিজীবনে যেমন মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সামষ্টিক জীবনেও মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজ জীবনে একজন মানুষকে অন্য অনেক মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে কাজ করতে হয়। সেখানে তাকে তার মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা আছে, যাদের নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ রয়েছে। এই মূল্যবোধগুলো সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রণীত। এগুলো একটি সংস্থার পরিচয়, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও অগ্রাধিকারগুলো প্রকাশ করে। সংস্থার কর্মীগণ এগুলো দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্ম-সম্পাদন করতে সচেষ্ট থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিক বা সংস্থাগত মূল্যবোধগুলোর মধ্যে রয়েছে, যেমন: স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দলগত কাজ, সৃজনশীলতা, মানুষকে মূল্য দেওয়া, দরিদ্র ও শিশুদের প্রতি অগ্রাধিকার, কৌশলগত জোট, উৎপাদনশীলতা, গুণগতমান বজায় রাখা, কাস্টমারদের সন্তুষ্টি ইত্যাদি। বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতার কারণে মূল্যবোধগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির মূল্যবোধগুলো যদি সংস্থার মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে উক্ত কর্মী সেই সংস্থায় কাজ করতে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এগুলো তাঁর নিষ্ঠা, কর্ম-দক্ষতা, কর্ম-সম্পাদন ইত্যাদি বৃদ্ধি করে। মূল্যবোধসম্পন্ন নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী সংস্থার সুনাম ও সফলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সংস্থার মূল্যবোধগুলো কর্মীদের পাশাপাশি তার কাস্টমারদেরও অনুপ্রাণিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত শক্তিশালী বিপণন সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে। কারণ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা তৈরী ক'রে নতুন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে এবং কোম্পানির পণ্য ক্রয় করতে বা সেবা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

কাজেই বলা যায় যে, ব্যক্তির মূল্যবোধগুলো যেমন ব্যক্তিকে পরিচালনা করে, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধগুলো একটি প্রতিষ্ঠানকে সামগ্রীকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অনেক কারণ রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

পরিবারে মূল্যবোধের অভাব: বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারেই পিতামাতাগণ সন্তানদের সামনে অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করতে পারছেন না। ভালবাসা, সহনশীলতা, নম্রতা, ক্ষমা, ত্যাগস্বীকার, দানশীলতা ইত্যাদির পরিবর্তে দেখা যায় কলহ, মনোমালিন্য, ক্ষমাহীনতা, অসহিষ্ণুতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি। পরিবারে মূল্যবোধের এই অভাব পরবর্তীতে তাদের জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

অর্থ ও বিষয়াসক্তি: সমাজে এখন এমন দেখা যায় যে, যার যত অর্থবিত্ত, তার তত সম্মান ও প্রতিপত্তি। ফলে সকল প্রকার নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অর্থ যখন সম্মান ও প্রতিপত্তির মাপকাঠি হয়ে উঠে, মূল্যবোধ তখন নীরবে প্রস্থান করে। অর্থ উপার্জনের এই অশুভ প্রতিযোগিতা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবোধের অভাব: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ: ফলাফলকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। যে প্রতিষ্ঠানের ফলাফল যত ভালো, সেই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও আয় তত বেশী। এই কারণে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই সকল প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ কেবল ভালো ফলাফলের দিকে, শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের দিকে নয়।

মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকা: আকাশ সংস্কৃতি ও ইন্টারনেটের এই যুগে অধিকাংশ দেশী-বিদেশী চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে বিনোদনের নামে নানা অরুচিকর বিষয়, সহিংসতা, বাজে ভাষা ও প্রতিশোধপূর্ণ নাটক-সিনেমা প্রচারিত হচ্ছে। অধিকাংশ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাদের দর্শক-শ্রোতা বাড়ানো ও বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, মারামারি ইত্যাদি নেতিবাচক খবরগুলো চটকদার শিরোনাম দিয়ে বড় বড় হরফে প্রকাশ বা প্রচার করে যাচ্ছে। এসব বিষয় দর্শক ও পাঠকবৃন্দ, বিশেষত তরুণ সমাজের মধ্যে মূল্যবোধ গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখবে তা প্রত্যাশা করা যায় না।

রোল মডেলের অভাব: তরুণ ও যুব সমাজ কাউকে তাদের রোল মডেল হিসাবে গ্রহণ ক'রে তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণ ও অনুসরণ করতে চায়। তাদের সামনে এই রোল মডেল হতে পারেন পরিবারের পিতামাতা থেকে শুরু করে সামাজিক বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কিংবা কোনো সেলিব্রেটি। কিন্তু বর্তমান সময়ে সেই ধরনের রোল মডেল যারা সঠিক মূল্যবোধগুলো ধারণ ও সেই অনুসারে জীবন যাপন করেন, তার বড়ই অভাব।

আদর্শিক রাজনীতির অভাব: রাজনীতির মধ্যে এসময় নানা ধরনের নীতিহীনতা দেখা যাচ্ছে। আদর্শিক রাজনীতি জায়গা দখল করে নিচ্ছে নানা নীতিহীন ও জোর-জবরদস্তিমূলক কর্মকান্ড। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র ও যুবসমাজকে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদগুলো শিক্ষার্থীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের পরিবর্তে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দলাদলি, মারামারি, খুনোখুনি ইত্যাদি অনৈতিক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে লিপ্ত হচ্ছে। নেতাদের মধ্যে কর্মীরা তেমন আদর্শ দেখতে পায় না যা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। ফলে বর্তমান প্রজন্ম ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধহীন ভবিষ্যত নাগরিক হিসাবে বেড়ে উঠছে।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রভাব

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সমাজে এর মারাত্মক কুপ্রভাব দেখা যাচ্ছে যা সমাজ-সচেতন ও বিবেকবান মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। মূল্যবোধের অভাবের কারণে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি অনৈতিক ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামান্য কারণে সহজেই মানুষ একে অপরের সাথে দ্বন্দ্ব, কলহ ও মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে একতা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে সৃষ্টি হচ্ছে অনৈক্য, অশান্তি, ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতা। কিছু মানুষের (মানুষ না বলে অমানুষ বলাই ভালো) মানবিকতাবোধ এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, দুই-তিন বছরের শিশুরাও তাদের পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমাজ থেকে আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে নারীরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ উপার্জনের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করছে না। ফলে অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি ও ঘুষের মত সামাজিক ব্যধিগুলো দিন দিন বেড়েই চলেছে। সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিশেষত তরুণ ও যুব সমাজের মধ্যে মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে না পারলে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

মূল্যবোধের সংকট থেকে উত্তরণের জন্য করণীয়

সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে বস্তুবাদ, ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা মানুষকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছে, সেখানে মূল্যবোধের এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়। তবুও দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তথা শিশু, তরুণ ও যুব সমাজের কথা চিন্তা ক'রে যার যার অবস্থান থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

পরিবারে মূল্যবোধের চর্চা: পরিবার হলো শিশুর প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষালয়। এখানে সে যা দেখে তা-ই সে তার শিশুমনে গ্রহণ করে নেয় যা তার পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে। যেমন, কোনো পরিবারের পিতামাতা যদি গরীবদের প্রতি দানশীল হন, তাহলে সেই পরিবারে বেড়ে উঠা শিশুটি বড় হয়ে দানশীল হবে, এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে সহনশীলতা, সদাচরণ, সততা, ক্ষমাশীলতা এইসব মূল্যবোধগুলো সে পরিবার থেকেই প্রথম শেখে। তাই পরিবারে মূল্যবোধের চর্চা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী-সাথী নির্বাচন: ছেলেমেয়েরা যখন বড় হতে থাকে তখন তারা গ্রামে, পাড়া-মহল্লায় ও বিদ্যালয়ে নানা ধরনের বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্যে আসে ও তাদের সাথে মেলামেশা করে। পিতামাতা ও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের সন্তানেরা কাদের সাথে মেলামেশা করে, কোথায় যায়, কি করে। এসময় যথাযথ দিক-নির্দেশনা খুবই প্রয়োজন। কারণ, আমরা জানি 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' ভালো বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথী, ভালো জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব প্রদান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলাফলের পাশাপাশি মূল্যবোধের উপরও সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয়গুলোর মতই মূল্যবোধভিত্তিক বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা খুবই প্রয়োজন। পাশাপাশি সহ-পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রমগুলোর মধ্যেও মূল্যবোধভিত্তিক বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেওয়া আবশ্যক।

মিডিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা: মিডিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষকে সহজেই প্রভাবিত করে। মিডিয়াগুলোকে তথাকথিক জনপ্রিয়তা বা বাণিজ্যিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নেতিবাচক সংবাদগুলোকে অতিমাত্রায় হাইলাইট না করে ইতিবাচক বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের জীবনের সততা ও সাফল্যের ঘটনাগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে প্রচার করতে হবে। এক্ষত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদেরও আরও সচেতন ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। মত প্রকাশের স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম মনে করে এমন কিছু লেখা বা পোষ্ট করা উচিৎ নয়, যা মানুষকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। গঠনমূলক ও অনুপ্রেরণাদায়ী সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলোকে বেশী করে তুলে ধরতে হবে যা মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করবে।

অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন: সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যারা নেতৃত্বের অবস্থানে রয়েছেন কিংবা খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সেলিব্রেটি হিসাবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের কর্মকান্ড ও জীবনযাপন এমন হওয় উচিত যাতে তরুণরা রোল মডেল হিসাবে তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে। সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সেলিব্রেটিগণ তাদের সুন্দর জীবনাদর্শ দ্বারা তরুণ সমাজের মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

জীবন গঠনমূলক বই: বই হলো মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। ভালো বই মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করে। তাকে আলোর পথে চালিত করে। তাই ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনকাহিনী ও নৈতিক শিক্ষামূলক বই পড়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে যা তাদেরকে সুন্দর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকদের সহযোগিতা ও দিক-নির্দেশনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, মূল্যবোধহীন মানুষ কেবল অকার্যকর নয়, সমাজের জন্য বিপজ্জনকও বটে। এ কারণে আমাদের প্রত্যেককে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আগামী প্রজন্মকে সঠিক মূল্যবোধের আলোকে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমরা যদি এখনই মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গঠনে সচেতন না হই, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে যার দায় পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, নেতা-নেতৃ বা রাষ্ট্রপরিচালক হিসাবে আমরা কেউই এড়াতে পারবো না॥

সহায়তা: ইন্টারনেট

খ্রিস্টমণ্ডলীর পথচলায় ভক্তসমাজের অংশগ্রহণ

ফাদার সুশীল লুইস

শুরুর কথা: আগের যুগে আমরা নদীতে একটি নৌকার মাস্তুলে দড়ি বেঁধে কয়েক জন মিলে তা টেনে নিতে অনেকেই দেখেছি। সেরূপ একটি নৌকা টানাটানির উদাহরণ এখানে লেখার শুরুতে ব্যবহার করছি। সবাই যদি যার যার মত তা টানতে থাকে নৌকাটি কোনদিকে যাবে? হতে পারে সঠিক পথে যাবে না; অনেক শক্তি, সময়, ধৈর্য নষ্ট হবে তারপরও জানা নেই শেষে তা কোনদিকে যাবে। অনুমান করা হয় যার শক্তি বেশী তা সে দিকে যাবে বা স্রোত বেশী থাকলে স্রোতের টানে কোনদিকে চলে যাবে। তবে সবাই যদি একত্রে দড়ি বেঁধে একযোগে এক দিকে টানতে থাকে তবে বিরোধিতা আসলেও নৌকাটি সহজে নির্দিষ্ট দিকে যেতে পারে। মণ্ডলী যেন একটা বড় নৌকার মত। সেটিকে ঠিক পথে নেবার জন্য বিশপ, যাজক, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখ্রিস্ট, সর্বস্তরের ভক্তগণ মিলে যার যার বাস্তবতা অনুসারে লক্ষ্য অনুসরণে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায় যার যার ভূমিকা একযোগে সময়মত পালন করলে সফলতা, আনন্দ, গন্তব্য আসবে। এখন মণ্ডলী ও ভক্তসমাজ এ শব্দগুলির ধারণা বিষয়ে একটু দেখতে চাই।

খ্রিস্টমণ্ডলী ও ভক্তসমাজ মণ্ডলী কাদের বা কারা মণ্ডলী এটি এক বড় প্রশ্ন। সকলে মিলে মণ্ডলী; মণ্ডলী আমাদের; আমরাই মণ্ডলী। তাই সকলে একত্রে অংশভাগী হিসাবে কাজ করাই সার কথা। মণ্ডলী হল শিষ্যদের প্রচারে ও কাজে যিশুর নামে যুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত জনগণ। সেভাবে যারা বিশ্বব্যাপী পোপ পরিচালিত প্রকাশ্য ধর্মীয় সমাজ অনুসরণ করে, ধর্মকর্ম করে তাদেরই এখানে আমি একত্রে খ্রিস্টমণ্ডলী বলে আখ্যা দিচ্ছি। এর মধ্যে থাকে ভাইবোনরূপ মানুষের সেবায় নিয়োজিত পুণ্য ক্ষমতা দ্বারা ভূষিত ও অভিষিক্ত (কার্ডিনাল, বিশপ, যাজক, ডিকন..) ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ আর অন্য সকলে যাদের আমরা বলি ঐশ জনগণ, খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ, বিশেষভাবে খ্রিস্টপ্রসাদে যিশুতে মিলিত বিশ্বাসী সমাজ। সেদিক থেকে বলতে হয় যে, ঐশ জনগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খ্রিস্টীয় মর্যাদায় ভূষিত দায়িত্বসমূহের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ থাকেন যারা মুক্তি অর্জনে সকল ভাইবোনের পরিচালনা ও সেবায় নিয়োজিত (দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার খ্রিস্ট*মণ্ডলী* বিষয়ক সংধানের ১৮ নং অনুচ্ছেদ)। সেভাবে মণ্ডলীতে থাকে পরিচালক-কর্তৃপক্ষ-গুরু আর গোটা মণ্ডলী দেহের সকল ভাইবোন; যারা মণ্ডলীর সমস্ত কিছুতে আসক্ত সকল ভক্ত বা ভক্তসমাজ। যারা যিশু স্থাপিত মণ্ডলীর শিষ্য তারাই ভক্ত। আর এভাবে তারা সকলে মিলে হল ভক্ত সমাজ। ভক্ত, শিষ্য, অনুসারী, আসক্ত প্রায় একই ধরনের ভাব প্রকাশ করে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা খ্রীষ্টভক্তদের মণ্ডলীতে *ভক্তসাধারণ* বলে পরিচয় দেয় (খ্রীষ্ট মণ্ডলী অনুচ্ছেদ ৩০)। মণ্ডলীর লক্ষ্য হল জগতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য যিশুর শিক্ষা প্রচার করা, মঙ্গল কাজ করা, মুক্তি ও পুণ্য সংস্কারসমূহ উদ্‌যাপন করা। সেদিক থেকে এখন কথা হল সারা পৃথিবীতে ও আমাদের দেশে মণ্ডলীর অনেক কাজ ও কর্তব্য রয়েছে আর এসব কিছুতে পরিচালকবর্গের পাশাপাশি ধর্মাশ্রয়ীদের কীরূপ ভূমিকা ও অংশ রয়েছে বা থাকতে পারে সেটাই লেখার প্রধান বিষয়। লেখার প্রসঙ্গ অনেক ব্যাপক তাই মাত্র কিছু কিছু বিষয় এখানে আনার চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশের মণ্ডলী ও ভক্তদের কিছু দিক: কয়েকশ বছর চলে গেছে বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম। সেখানে শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, সক্রিয়তা, অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এসেছে অনেক অগ্রগতি। মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য ভক্তজনগণ অনেক অবদান রেখে যাচ্ছেন আমরা সবাই তা জানি তারপরও তাদের সামর্থ অনুযায়ী পালকদের সাথে এক মন হয়ে প্রত্যেক ভক্তের সমস্ত কাজে সহযোগিতা করার অনেক বিষয় রয়েছে।

তারপরও এটি এমন একটি ভৌগলিক এলাকা যেখানে এখনো স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী যথেষ্ট পরিমাণে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারেনি। কয়েকবার প্রশ্ন আসে- "মণ্ডলী কেন আমাদের হল না? মাত্র কয়েকজনের ভূমিকা ও অন্যের সহায়তার উপর রয়ে গেছে?" অনেক কিছু সরাসরি পরিচালকবর্গকে করতে হয়। সেভাবে ফাদারদের যে কত কি করতে হয়! কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আসে না, দায়িত্ব নেয় না, নিজের বলে মনে ক'রে কোন কিছু করতে চায় না। অনেক অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দিলেও আজ কেউ কেউ শামুকের মত, দ্বীপের মত হয়ে আছে-নিজেকে ও স্ব-প্রয়োজন নিয়ে আশঙ্কাজনকভাবে সচেতন ও দক্ষ। অনেকে কিছু করলেই বিনিময়ে টাকা বা কিছু চায়, নিজের বলে কিছু করতে এগিয়ে আসে না। কোন কোন দেশে ভক্তজনগণ মণ্ডলী শুরু ক'রে তা পরিচালনায় নিজেরা সমন্বিত সাহায্য-সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। মণ্ডলী তো নিজেদের সবার, শুধু বিশপ, ফাদারদের নয়। এটি আমাদের দেশের সকলকে বুঝাতে ও বুঝতে হবে আর সেভাবে সক্রিয় হওয়া এক বড় কথা। মণ্ডলীর নেতাগণও বিশ্বাসীদের উপযুক্ত পালক হয়ে তাদের অবদান ও অনুগ্রহদানের স্বীকৃতি দিবেন।

আমরা সংখ্যায় কম, তুলনামূলভাবে দুর্বল, তাই সকলে একত্রে কাজ করাই তো পারস্পরিক সমর্থন, আনন্দ, সম্পর্ক ও শক্তির পরিচয়। এখানে কোন না কোনভাবে বা কয়েকবার উপরের নৌকা টানাটানির মত পক্ষ, এক দিকে টানাটানি, স্বার্থ, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, আগে-পরে প্রভৃতি দিকগুলি চিন্তায় আসতে পারে। তবে দায়িত্ব হল সবার; যার যার বয়স, স্থান, শিক্ষা, যোগ্যতা, বাস্তবতা, সময় প্রভৃতি বিবেচনায় সক্রিয়তা। যার যার কাজে সহযোগিতায়, অংশগ্রহণে আমরা আমাদের গন্তব্যে উপনীত হব, সফলতা লাভ করব, সকলে মিলে আনন্দ করব। এদেশে ছোট মণ্ডলী তাই সবার, সর্বত্র ও সবসময় অনেক দায়িত্ব রয়েছে অর্থাৎ আমাদের প্রতি কোন কাজ সম্পাদনের ভার আছে অতএব আমাদের এটা অবশ্যই করতে হবে এরূপ বোধ থাকা অতি জরুরী।

একসঙ্গে চলা হল বড় বিষয়- একদেহে সবাই যার যার কাজ করে একত্রে চলে। কোনটির কাজ ও অংশগ্রহণ যত ছোট ও নগন্য হোক না কেন বন্ধ হলে যেন সবার কাজ বন্ধ হয়ে যায়, সমস্যা সৃষ্টি হয়। মণ্ডলীরূপ খ্রিস্টদেহে ছোট বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত- কমশিক্ষিত, কাছের-দূরের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের মূল্য ও সম্মান রয়েছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার *খ্রীষ্টমণ্ডলী* বিষয়ক সংধিানের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "সকলে "ভালবাসার প্রেরণায় সত্যনিষ্ঠ হয়ে সব দিক দিয়ে আরও নিবিড়ভাবেই খ্রীষ্টের অঙ্গ হয়ে উঠবে। মস্তকস্বরূপ তিনি, তাঁরই উপর নির্ভর করে সমগ্র দেহ তার যত গ্রন্থির বাঁধন-শক্তিতে সুসংবদ্ধ সুসংহত হয়ে আছে; তারই উপর নির্ভর করে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সক্রিয় কর্মক্ষমতা অনুসারেই সমগ্র দেহটি গড়ে

উঠেছে আর নিজেকে গেঁথে তুলছে ভালবাসারই গাঁথুনিতে" *(এফে ৪: ১৫-১৬)*।

ফাদারগণ মণ্ডলীর নামে কাজ করেন। এক ফাদার কোথাও সেবা কাজ করে চলে গেলে অনেক বার সেখানে তার শিক্ষা, কর্মপন্থা, চিন্তা প্রভৃতি বন্ধ হয়ে যায়। তার মানে হল সেখানে ভক্তদের সত্যিকার অংশগ্রহণ ও প্রত্যয় থাকে না। ফাদার নেই তার কাজও নেই, পদক্ষেপও নেই। মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে সেখানে প্রত্যয় ও চেতনা দান ক'রে সত্যিকার অংশগ্রহণ বাড়ানো সম্ভব আর সেটিই যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে সফলতাসহ। আমাদের দেশে এটির অভাব উপলব্ধি করি।

ভক্তদের আহ্বান রয়েছে তাদের প্রতিদিনের ব্যস্ততায় আত্মায় চালিত হয়ে পৃথিবীতে খামি হিসাবে কাজ করতে, পৃথিবীকে প্রভাবিত করতে। মণ্ডলীর সদস্যরা নানাভাবে তার কাজ করে থাকে। তাদের দায়িত্ব রয়েছে নানা অবস্থায় মণ্ডলীর কাজে সহায়তা করা, খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করা। আর সেভাবে মণ্ডলী সকল সদস্যদের মাধ্যমে পৃথিবীতে কাজ করে যেভাবে এক দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজে দেহ সচল থাকে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার *ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ* বিষয়ক নির্দেশনামার ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "পিতা ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশে পৃথিবীর সর্বত্র খ্রিস্টের রাজ্য বিস্তার করতে, সব মানুষকে মুক্তি ও পরিত্রাণ কার্যের অংশীদার করতে এবং তাদের মাধ্যমে খ্রিস্টের সাথে সমগ্র বিশ্বের যথার্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে।...মণ্ডলী অর্থাৎ খ্রিস্টদেহের ক্ষেত্রেও ইহা সত্য: "প্রত্যেক অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী সক্রিয় হওয়ায় দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে" *(এফে ৪:১৬)*। এই দেহের সদস্যদের মধ্যে এমন গভীর ঐক্য ও সংহতি *(এফে ৪:১৬)* রয়েছে যে, একজন সদস্য, যে এই দেহের বৃদ্ধির জন্য তার নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে ব্যবহার না করে, সে মণ্ডলী ও নিজের জন্য অকেজো বলে গণ্য হবে।" মণ্ডলীর চালকগণ ভক্তদের বিভিন্ন কাজে জড়িত করবেন স্থান-কাল-ভেদে।

শিষ্যযুগের ভক্তদের *(শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭)* সুন্দর জীবন ধ্যান করলে বুঝতে পারি যে, তারা একমন, একপ্রাণ হয়ে সম্প্রীতির বন্ধনে জীবন যাপন করতেন, কাজ করতেন। প্রথমযুগের বিশ্বাসীদের মত সকলে একমন, একপ্রাণ হয়ে থাকার পরামর্শ পাওয়া যায় শিষ্যগণের শিক্ষায়।

বর্তমান মণ্ডলীর জীবন, কাজ, পরিকল্পনা প্রভৃতির কিছু দিক

ধর্মকর্ম: ভক্তজনগণ উপাসনা, ধর্মকর্মে এক হবে ও নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি প্রতিভা ব্যবহার করে স্থান, কাল ভেদে বিচিত্র ভূমিকা পালন করতে সক্রিয় হবে। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য ক্ষেত্র খোলা রয়েছে। এর পাশাপাশি পালক পুরোহিতের ভক্তদের ধর্মশিক্ষাদানের যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে খ্রিস্টভক্তদের, বিশেষভাবে ধর্মপ্রচারকদের স্বেচ্ছাশ্রমের এক বিশাল ক্ষেত্র হাতছানি দিয়ে ডাকছে সারা দেশে। মণ্ডলীর আইনের ৭৭৬ নং ধারায় বলা হয়: "কোন বাঁধা না থাকলে তারা সকলে সে ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে যেন অস্বীকার না করে।" মণ্ডলীর আইনের ৮৩৪,২ ধারা অনুসারে সংস্কার গ্রহণের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও যারা সংস্কার চায় তাদের উপযুক্ত ধর্মীয়/বাইবেলীয় শিক্ষা ও গঠন নিশ্চিত করার কর্তব্য থাকে যার যার ভূমিকা অনুসারে পালকদের সাথে অন্য ভক্তদেরও। তবে বিভিন্ন স্থানে বার বার বলা হয় ছেলেমেয়েদের খ্রিস্টান জীবন ও বিশ্বাসে গঠন দিতে পিতামাতার স্থান প্রথম।

প্রচার কাজ: প্রচার কাজ শুধু ফাদার ও কাটেখিস্টগণের দায়িত্ব নয়। মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ভক্তের প্রচার কাজে বড় দায়িত্ব রয়েছে (দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার *ভক্তসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ* বিষয়ক নির্দেশ নামার ১৬ নং অনুচ্ছেদ)। ছোট বড়, ধনী-গরীব, ছেলেমেয়ে, মা বাবা যে যেখানে আছে সবাই এ কাজে ডাক পেয়েছে। প্রচারেই ভক্তের জীবন ও পরিচয়; আর এভাবে প্রচার করতে করতেই ভক্তের জীবনে সফলতা, আনন্দ। এ কাজে স্বেচ্ছায় আরো অনেককে এগিয়ে আসতে হবে।

দয়ার কাজ: তারা দয়ার কাজে যিশুর ভালবাসাকে বাস্তব করে তোলে আর সবার সামনে ঐশ রাজ্য প্রচার করে প্রতিদিনের জীবনে। আমাদের দেশে দয়ার কাজের যে কত ক্ষেত্র রয়েছে তা বলা কঠিন। অন্তরে ভালবাসা নিয়ে দয়ার কাজ করতে করতে ভক্তরা দয়ালু যিশুর দয়ার মানুষ হতে পারে, দয়া পেতে পারে *(মথি ৫:৭)*। এজন্যে দলে, সংঘে, প্রতিষ্ঠানে নানা সুযোগ ও কার্যক্রম আছে।

প্রশাসন ও পরিচালনা: মণ্ডলীর পরিচালনা ও প্রশাসনিক ক্রিয়ায়ও ভক্তগণ নানাভাবে সহায়তা করতে পারে, যেমন বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানে। এসব কাজে তারা মণ্ডলীকে নানাভাবে সহায়তা করতে পারে।

গঠন কাজ: পিতামাতা, অভিভাবকবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, নানা প্রতিষ্ঠানে জড়িত ব্যক্তবর্গ অন্যদের গঠনে অবদান রাখতে পারে। মণ্ডলীর শিক্ষাগঠন কাজে সবার কোন না কোন দায়িত্ব আছে। যে যেভাবে পারে সে কাজে সহায়তা করবে এটাই সবার প্রত্যাশা। তবে গঠন দিতে প্রথমে নিজেকে সুপথে গঠিত করতে হবে। এর জন্য সময় দিতে হবে, কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, প্রয়োজনে অর্থও দিতে হতে পারে।

নির্মাণ কাজ: যাজকগণকে বিভিন্ন সময়ে অনেক নির্মাণ কাজ করতে হয়। ভক্তগণ নির্মাণ কাজেও নানা দায়িত্ব পালন করতে পারে। এসব বিষয়ে তাদের অনেক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে- সেগুলি ব্যবহার ক'রে তারা মণ্ডলীকে শক্ত, স্বাবলম্বী, অংশগ্রহণকারী ক'রে তুলবে। অন্যদিকে যাজকগণ যারা এসবে জড়িত তাদেরও চাপ কিছুটা কমতে পারে।

শিক্ষা কাজ: শিক্ষা হল যুগের এক প্রয়োজনীয় সেবাকাজ। তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখতে পারে। মণ্ডলীর একটি বড় পরিচয় তা শিক্ষা দান করে। আর তা বাস্তবায়িত হতে পারে ভক্তদের অংশগ্রহণে। যেমন তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশ নিতে পারে, অন্য কোন ভাবে শিক্ষা দানে বড় অবদান রাখতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব দিতে হয়, সচেতন করতে হয় আর তাদের গঠন দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সিস্টার ও কাটেখিস্টগণ এসব করেন, তবে কবে আরো ব্যাপকভাবে এসব কিছু ভক্ত জনগণ তাদের নিজেদের কাজ মনে করে করবেন? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানবিক, পালকীয়, গঠনমূলক দিকগুলিও বিবেচনায় আনা দরকার।

শান্তি ও ন্যায্যতা স্থাপন: বিশপ, যাজকগণের পাশাপাশি ভক্তদের এসব ক্ষেত্রে করণীয় থাকে অনেক। যেমন তারা বিভিন্ন দলে, সংঘে, সভায়, সময় দিয়ে, ত্যাগ স্বীকার ক'রে নানা ক্ষেত্রে অনেক অবদান রাখতে পারেন যাজকগণের পাশাপাশি বা নিজেদের উদ্যোগে। এভাবে তারা শান্তি স্থাপনে ঐশরাজ্য বিস্তার করতে ও ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হতে পারে (মথি ৫:৯)।

সম্পর্ক ও সংলাপ: ভক্তগণ তাদের ভালবাসা, জীবন, চলাচল, কথা, কাজ, ধর্মকর্ম, আদর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের সাথে সংলাপ করতে ও সম্পর্ক গড়তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

উন্নয়ন কাজ: উন্নয়ন কাজে মণ্ডলী তার নিজের পরিচয় প্রকাশ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভক্তদের এক বড় অবদান থাকতে পারে। সমাজ, পরিবার, শ্রেণি এক অবস্থা থেকে অন্য

অবস্থায় নিয়ে যেতে, উন্নতি আনতে ভক্তদের যা আছে তা দিয়েই তারা সার্বিক সহায়তা করবে।

ভবিষ্যতের কাজ, পদক্ষেপ ও চিন্তার জন্য কিছু মতামত, প্রসঙ্গ, ধারণা উপস্থাপন করছি:

- মণ্ডলী নিজেরা, মণ্ডলী নিজেদের ভক্তদের এ মনোভাব বাড়াতে হবে। নিজেদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তাদের শিক্ষা-গঠন, সচেতনতা, সদিচ্ছা, ত্যাগস্বীকারের মনোভাব, সময় দেবার মনোভাব, কাজ, প্রচেষ্টা প্রভৃতি প্রয়োজন। কিছু কিছু কাজ, দায়িত্ব তাদের উপর ছেড়ে দেবার চিন্তা ও পদক্ষেপ প্রয়োজন হতে পারে।

-মানুষের মধ্যে গঠন, নেতৃত্ব, সমঝোতা, সমন্বয় বাড়াতে হবে যেন তারা দায়িত্ব নিতে ও পরিচালনা/শিক্ষা দিতে পারে। যেমন ভাল প্রচারক নেই, শিক্ষা দেবার মত কাউকেও পেতে কষ্ট হয়।

-ভক্তদেরও দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসতে পদক্ষেপ নিতে হবে। পরে সঠিক লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে হবে।

এখানে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আর সেটি হল আমরা অল্প মানুষ, অনেক গঠন প্রশিক্ষণ হয়, আলোচনা, শিক্ষা হয় কিন্তু কোন না কোন কারণে অনেকবার আশানুরূপ ফল ও নবায়ন আসে না। অনেক কিছু সেভাবে হতেই থাকে! অনেক বার আদর্শ ও শিক্ষা বিপরীত ফল আসে। কয়েকবার সেসব স্থানে আসে স্বার্থদ্বন্দ্ব, দলাদলি, তিক্ততা, ঘৃণা প্রভৃতি। এ কঠিন প্রশ্ন: এসব ক্ষেত্রে ভক্তদের সঠিক অংশগ্রহণ বাড়াতে কি কি করা যেতে পারে?

-দালান বানানোর জন্য অনেক কাজ হচ্ছে তবে মানুষ বানানোর, গঠনের কাজ কিছুটা সীমিত।

-ছড়িয়ে পড়া ভক্তদের প্রয়োজনীয় পালকীয় যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে অন্য ভক্তদের করণীয় অনেক।

-ভক্ত ও যাজকদের মধ্যে মিলন, সুসম্পর্ক বাড়ানো এক যুগোপযোগী বিষয়।

-মানুষের সামাজিকতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্পর্ক বাড়াতে অনেক কাজ করতে হবে।

-উপাসনার গভীরতা উপলব্ধি ও আবিষ্কার করতে অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। কোন একটি লেখায় পড়েছি "মণ্ডলী/গির্জা কখনো একটি স্থান নয়, কিন্তু সর্বদা এক উপাসকমণ্ডলী, বিশ্বাসীসমাজ। গির্জা হল ভক্তবৃন্দ, যারা প্রার্থনা করে, যেখানে তারা প্রার্থনা করে সে স্থান নয়।" সেভাবে মণ্ডলী হল ভক্তসমাজ নিজেরা।

-সন্ত্রাস, দুর্নীতি, বিবাহ ও পরিবার ঘিরে বিশৃংখলা, অনিয়ম প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভক্তদের ভূমিকা, পদক্ষেপ, সচেতনতা কেমন ছিল বা আছে তা চিন্তার প্রয়োজন আছে।

-সেবা কাজ, চিকিৎসা সেবা ও বাণী প্রচারে ভক্তদের ভূমিকা আরো জোরালো করা আবশ্যক।

মণ্ডলীতে ধর্মীয় জীবনের অনেকে শুধু শিক্ষাব্রতী বা ব্রতিনী না হয়ে সম্ভব হলে আরো একটু বেশী ধর্মব্রতী হলে আরো ভাল ফল আসতে পারবে বলে মনে হয়। এসব ক্ষেত্রে অনেক কাজ করা দরকার।

উপসংহার: এ লেখার শেষের দিকে শিশু ও মায়ের উদাহরণ ব্যবহার করতে চাই। মা শিশুকে আদর যত্ন করে আর সেভাবে সে শিশু বড় হতে থাকে। দিন যেতে যেতে মায়ের দায়িত্ব হল শিশুকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে, স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা, সুযোগ ও পরিবেশ দেয়া। তাহলে সে শিশু চেষ্টা করবে আস্তে আস্তে হাঁটতে, দাঁড়াতে পরে দৌড়াতে। মা সব করে দিলে, না ছাড়লে, সুযোগ না দিলে এসব কিছু সম্ভব নয়। মা শিশুকে অনেক কিছু করে দিবে আবার অনেক কিছু শিশুকেও করতে দিবে। সেভাবে দুজন মিলে একত্রে চলতে পারবে। মণ্ডলীতেও একই ঈশ্বর মানুষদের যেসব আধ্যাত্মিক গুণ দেন মন্ডলী গঠনের জন্য সকলে মিলে সেসব ব্যবহার করে কাজ করলে মণ্ডলী আরো ভাল চলবে।

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার খ্রিস্ট-মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদ বলে: তারা প্রত্যেকে অনুগ্রহদান ব্যবহার করে খ্রিস্টের দেহ গড়ে তোলার জন্য পবিত্র আত্মার পরিচালনায় সবাই এক হয়। রোমীয় ১২:১০ বলে: "ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর সেতুবন্ধন গড়ে তোলে।"

মণ্ডলী হল ভক্তদের জন্য, তাদের দ্বারা ও তাদের মধ্যে। অংশগ্রহণ, মিলন, একতা শুধু মুখে মুখে হবে না, অনুষ্ঠানে, এলাকা, ভাষা, মিশন, দীক্ষা প্রভৃতি এক থাকলে হবে না; হতে হবে মনে, চিন্তা-চেতনায়, জীবন গভীরে, সম্পর্ক, ধর্মকর্ম ও জীবনাচরণে। এফেসীয় ৪:১২ বলা হয়: "যাতে ভক্তজনেরা খ্রিস্টীয় সেবা কর্মের জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হয়ে ওঠতে পারে আর এই ভাবেই গড়ে তুলতে পারে খ্রিস্টের সেই দেহটি।" প্রত্যেকের অংশ নেবার, সময় দেবার, দায়িত্ব পালন করার গভীর ইচ্ছা, নিবেদন ও দৃঢ়তা থাকতে হবে। তখন কঠিন ও ভারী কাজ সহজ হবে, মানুষ আনন্দ পাবে, উপযুক্ত ফল লাভ করবে।

তখনই সামসঙ্গীত ১৩৩ এর ভাষায় উচ্চারণ করতে পারব: "আহা, কত ভাল লাগে ভাইয়ে ভাইয়ে এই একইসঙ্গে একপ্রাণ হয়ে থাকা!" মণ্ডলী আমরা, মণ্ডলী আমাদের। দেহের সব অঙ্গ যেমন যার যার স্থানে থেকে দেহের উপকারের জন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে তেমনি মণ্ডলীতে আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে-সবই মণ্ডলীর সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য করে যাব। আর আমরা প্রত্যেকে সেবায়, দয়ায়, ক্ষমায়, প্রচারে, শিক্ষায় সেরূপ অংশগ্রহণকারী ও দায়িত্বশীল মণ্ডলীর *(রোমীয় ১২:৪-৮; ১ করি ১২:৪-১১; ১ করি; ১২:১৪-২৭)* প্রত্যাশায় থাকলাম॥

ধৈর্যের চাবি সুখের দরজা খুলে দেয়

(৮৯ পৃষ্ঠার পর)

যায় এবং পক্ষান্তরে তারা রোগেও ভোগে। তাই ভালো থাকার অন্যতম একটি উপাদান ধৈর্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, ধৈর্য ধারণ করা, বা এই গুণের চর্চা করা প্রতিটি মানুষের জীবনে দরকার। আমরা চাইলে তিনটি উপায়ে নিজের জীবনে এই গুণের প্রয়োগ ঘটাতে পারি। ১) ধৈর্যশীল ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ আনা খুবই জরুরী। আত্মনিয়ন্ত্রণের সাথে ধৈর্যের বিষয়টি জড়িত। ২) তৃপ্তিদায়ক ও অর্থপূর্ণভাবে যে কোন কাজ ধৈর্য নিয়ে করা উচিৎ। কারণ এর ফলেই সফলতা আসবে। ৩) কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস গড়ে তোলা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে জরুরী ভাবে দরকার। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারবে তারা যে কোন কাজেই তুষ্ট হতে পারবে। তাই ধৈর্যের সাথে এই অভ্যাস চর্চা একান্ত ভাবে আবশ্যক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১। ধৈর্য ও সহনশীলতা (erfan.ir) সংগৃহীত
২। People of Bangladesh, May 31, 2016
৩। বাংলাদেশ প্রতিদিন, মীর মো. গোলাম মোস্তফা, ৩১ জুলাই, ২০২১
৪। সময়ের আলো, দৌলত আলী খান, ৯ডিসেম্বর, ২০১৯
৫। কালের কণ্ঠ : ১৫ এপ্রিল, ২০১৬ ॥

খোলা জানালা

পরিবেশ সংরক্ষণ উদ্দীপ্ত আধ্যাত্মিকতা

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্মে যেমন ও মানবজাতির ত্রাণকর্মেও তেমনি খ্রিস্ট অনন্য, তিনিই সব ও সবার ওপরে। খ্রিস্ট অনাদিকাল থেকেই পরম পিতার আপন পুত্র, পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি, সৃষ্টির অগ্রজাতক। তিনিই ত্রাণকর্মের সব-কিছুর আরম্ভ, তাঁকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট অসৃষ্ট সব-কিছুর পূর্ণতা তিনি *(কলসীয় ১:১৫-২০)*। আমাদের অভিন্ন বসতবাটি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় সাধারণ ধ্যান-ধারণা বা কল্পনার চাইতে আরো গভীর আধ্যাত্মিকতায় মনোনিবেশ করা প্রয়োজন; যা আমাদেরকে প্রকৃতি, পরিবেশ ও আমাদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষার্থে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাবে, উৎসাহিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে, পুষ্টিসাধন করবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত ও সমবেত কর্মকাণ্ডকে অর্থপূর্ণ করবে *(লাউদাতো সি ২১৬)*। ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস এর 'লাউদাতো সি' পত্রটি আমাদের সবাইকে মিলে একসাথে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে আহ্বান করছে। সুগভীর ধর্মবিশ্বাস খ্রিস্টভক্তদেরকে এবং সকল বিশ্বাসীদেরকে 'জগতের আর্তনাদ' ও 'দীন-দরিদ্রদের আর্তনাদ' এ সাড়া দিতে উৎসাহিত করে থাকে। এখানে পোপ মহোদয়ের 'লাউদাতো সি' পত্রটির আলোকে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আধ্যাত্মিকতার কিছু অনুধ্যান এবং আমাদের সাড়াদানের কিছু পথ ও পন্থা সহভাগিতা করা হয়েছে।

১. ঈশ্বর তাঁর রচিত সব কিছুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন- সত্যিই তা খুবই ভাল হয়েছে *(আদি ১;৩১)* এবং প্রত্যেক মানব ও মানবী ভালবাসার দ্বারা সৃষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট *(আদি ১:২৬)*। সৃষ্টির প্রতি পিতা ঈশ্বরের মতো আমাদের অন্তরে গভীর বিস্ময়বোধ এবং প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা কত অপরিমেয় তা আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আমরা জাগ্রত রাখতে পারি। ধ্যানময় অবস্থায় আমরা সব কিছুই তাঁর চোখ দিয়ে দেখি, তাঁর অন্তরে অনুভব করি এবং তাঁর কান দিয়ে শুনতে পারি। কারণ আমরা নিজের শক্তির ওপর নির্ভর করলে বেশিরভাগ সময় নিজের চোখে তাকিয়ে থাকি কিন্তু দেখি না, নিজের কানে শুনি কিন্তু বুঝি না *(লুক ৮:১০)*। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের চিন্তার ফসল, আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত, তাঁর ভালবাসার পাত্র এবং তাঁর নিকট মূল্যবান। তাই নির্মল বিস্ময়বোধ অন্তর নিয়ে আমাদের জন্য পরমপিতার অমূল্যদান সৃষ্টির জন্য প্রশংসা করতে পারি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি যত্নবান হতে পারি।

২. মানবজীবন তিনটি মৌলিক ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত- ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে এবং ধরিত্রী সঙ্গে *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ-৬৫-৬৬)*। পোপ ফ্রান্সিস আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন- ধরিত্রীর সব কিছুই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (লাউদাতো সি পত্র) এবং আমরা সবাই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সকলে ভাইবোন (ফ্রাতেল্লি তুত্তি পত্র)। যা আমাদেরকে সর্বজনীন মিলন-বন্ধনে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানায়। আমরা যখন বিস্ময়াভিভূত হয়ে বিশ্বজগতের সৌন্দর্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন হই তখন আমরা পরিপূর্ণ ত্রিত্বেরই প্রশংসা করতে দায়বদ্ধ। আমরা যত বেশি করে ঈশ্বরের সাথে, অপরাপর মানুষের সাথে এবং সকল সৃষ্টজীবের সাথে সম্পর্কসূত্র নবায়ন করি তত বেশি আমরা বিকশিত হই, পরিপক্কতা অর্জন করি ও পবিত্র হয়ে উঠি। সুতরাং সবকিছুই পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ আর সেই বন্ধনসূত্রের ভিত্তিতেই আমরা পবিত্র ত্রিত্বের রহস্যজাত বিশ্বজনীন একাত্মতার আধ্যাত্মিকতা গড়ে তোলার আহ্বান পাই। তখন জগতের আর্তনাদে ও দীন-দরিদ্রের আর্তনাদে সাড়াদান করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠি।

৩. ঈশ্বরের সঙ্গে, আমাদের প্রতিবেশীর সঙ্গে এবং ধরিত্রী সঙ্গে এই জীবনদায়ক সম্পর্কটি বাইরে যেমন আমাদের অন্তরের ভিতরেও তেমনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে। এই ভগ্নাবস্থাই হল পাপ। এখানে পাপময়তার প্রকাশ ঘটছে- যুদ্ধ, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, সহিংসতা, মানসিক নির্যাতন, চরম দুর্দশাগ্রস্তদের পরিত্যাগ এবং প্রকৃতির ক্ষতিসাধন আরো বহুবিধ *(লাউদাতো সি ৬৬)*। বিশ্বজগতে বাহ্যিক মরুভূমি বেড়েই চলছে, অভ্যন্তরীণ মরুপ্রান্তর ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরভাবে বিস্তারলাভ করেছে। সুতরাং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আধ্যাত্মিক চেতনা লাভে পোপ মহোদয় আমাদেরকে একটি আন্তরিক মনপরিবর্তনের জোরালো আহ্বান জানাচ্ছেন *(লাউদাতো সি ২১৭)*। মঙ্গলসমাচারে যিশু আকাশের পাখিদের সম্বন্ধে আমাদের বলেন- "ঈশ্বরের কাছে তাদের একটিও তুচ্ছ নয়" *(লুক ১২:৬)*। তাই আমরা কিভাবে এদের সাথে বিরূপ আচরণ বা কিভাবে এদের ক্ষতি সাধন করতে পারি? প্রতিটি সৃষ্টজীবই কোন-না-কোনভাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতিচ্ছবি, প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তার মধ্যে

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট একান্তভাবে উপস্থিত এবং তাঁর ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। বিশ্ব যেমন করোনাভাইরাস মহামারিটির একটি জরুরী অবস্থার মাঝে গভীর অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েও একত্রে সত্যিকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পুনরুদ্ধার করার জন্য সমস্তকিছু সংযুক্ত করছে; অর্থাৎ আমাদের যে বন্ধনগুলি ভেঙে ফেলেছি তা নিরাময় করতে চেষ্টা করছি। এই বিশেষ সময়ে আমাদের ধরিত্রীর পুনর্নবীকরণ এবং আমাদের মূল্যবান দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে সুযোগ করে দিয়েছে। আমরা অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করি- আবর্জনা এখানে-সেখানে ছুঁড়ে ফেলে অপরিচ্ছন্ন-অস্বাস্থ্যকর নর্দমা তৈরি করেছি; গাছ কেটেছি কিন্তু রোপনে অবহেলা করে পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট করেছি; স্বার্থপরতা ও অতিভোগের কারণে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ করে ফেলেছি; প্রতিনিয়ত প্রচুর পানি অপচয় করছি, খাল ও নদীর জল বিষাক্ত করে ফেলেছি; এভাবে প্রকৃতি ও প্রতিবেশীদের প্রতি অনেক ক্ষতি ইতোমধ্যে করেছি। আমাদের ভুলভ্রান্তি, পাপ, অপরাধ, ব্যর্থতা ও দায়িত্বপালনে অবহেলার দ্বারা সৃষ্টির ক্ষতিসাধন করেছি তা আমাদের অকপটে স্বীকার করতে হবে। সর্বাগ্রে আমাদেরই মনপরিবর্তন বা হৃদয়ের পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক অনুশীলনে ধ্যানে এসব স্মরণ করে অনুতপ্ত হই ও মন-পরিবর্তন করি এবং প্রকৃতি ও প্রতিবেশীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলি। ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মের যত্ন নেওয়া ও লালন ক'রে সৎ ও ধার্মিক জীবন যাপন করাই হচ্ছে আমাদের আহ্বানের মূল কথা, এটি খ্রিস্টীয় জীবনের কোন ঐচ্ছিক বিষয় নয় *(লাউদাতো সি ২১৭)*।

৪. আধ্যাত্মিক অনুশীলনে আমাদের গভীরে সবার শৈশবের প্রকৃতি ও আদি কৃষ্টি থেকে যা পেয়েছি-তার সাথে সংযোগ রেখে চলতে অনুপ্রাণিত করবে। আধুনিক প্রযুক্তিতে বেড়ে উঠে যেন ভূমি-জল-বায়ু-উদ্ভিদ থেকে পাওয়া ঋণ ভুলে না যাই। সহজ সরল বলে প্রকৃতিকে নিয়ে যেন লজ্জাবোধ না করি, কারণ সেখানে আছে বৃহত্তর প্রযুক্তির মিলন ও সমন্বয়নের শুভ গভীরতা ও মাধুর্য। তা পৃথিবীর অতি আদি ইতিহাস। আমাদের সর্বপ্রকার আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্য হবে "শিশু মানব কৃষ্টি"-এর সাথে একমন-একপ্রাণ হয়ে থাকা এবং তার যত্ন করা, তাকে নিয়ে বড় হওয়া (ধর্মোপদেশ: বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি)। মাটি, জল, পর্বত, আকাশ: সমস্ত কিছুই যেন ঈশ্বরের স্নেহময় সোহাগ ও আদরযত্ন। ঈশ্বরের সাথে আমাদের বন্ধুত্বের ইতিহাস সর্বদাই কতিপয় বিশেষ স্থান নির্দেশ করে যার মাধ্যমে সুগভীর ব্যক্তিগত অর্থবহতা প্রকাশ পায়: আমরা সকলে ঐ সকল স্থানের কথা স্মরণ করি এবং তার স্মৃতি রোমন্থন করে উপকৃত হই। যারা পার্বত্য অঞ্চলে লালিত-পালিত হয়েছি অথবা টিলাভূমিতে ঢেউ খেলানো চা বাগানের সবুজ প্রান্তরে বেড়ে উঠেছি অথবা বিস্তৃত বিল-হাওড়-নদীর ধারে যাদের শৈশব-কৈশোর কেটেছে অথবা যারা দ্বীপাঞ্চলে সাগরপাড়ে বালুভূমিতে ছুটাছুটি করে খেলাধূলা করেছি অথবা বাড়ির আশেপাশে খোলা জায়গায় বিশাল প্রান্তরে ছুটাছুটি করে খেলাধূলা করেছি; সে সব জায়গায় ফিরে যেতে পারলে নিজের সত্যিকার পরিচয় পুনর্নবায়ন করার সুয়োগ পেতাম। যখন আমি গাছ-গাছড়ার মাঝে থাকি আমার স্মরণে আসে- নিম, শিরীষ, অশ্বত্থ, বট, কদম, বকুল, সোনাঝুরি, তাল, কাঁঠাল, নারিকেল, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, অর্জুন, বহেড়া, আমলকী ও আরো অনেক দেশি গাছ-গাছালি; বিস্তর ধানক্ষেত, সরিষাক্ষেত; আর বাহারি শস্যেভরা মাঠের মাঝ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমি নিজের মাঝে পরিপূর্ণ আনন্দ ফিরে পাই। এরা আমাকে অন্যরকম আনন্দ ও বিস্ময়বোধ প্রকাশ করতে অন্তরকে উদ্দীপিত করে। আমি অন্তর থেকে বলে উঠি- তারা আমাকে বাঁচিয়েছে, সুরক্ষা করেছে, লালন-পালন করেছে, এবং এখনো প্রতিদিনই করে যাচ্ছে। যদি সময় সুযোগ করা যায় তবে শারীরিকভাবে একবার সেইসব জায়গায় যেতে পারি এবং মনোরম অভিজ্ঞতায় কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে পারি। এমন বিশ্রাম ও আনন্দ খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার একটি অংশ।

৫. খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতা এমন এক উন্নতি বা অগ্রগতির পৃষ্টপোষক যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিতব্যয়িতা এবং স্বল্প নিয়ে সুখী হওয়ার যোগ্যতা। এ হচ্ছে সেই সহজ-সরল জীবনধারা যেখানে আমরা অল্প নিয়েই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকতে, জীবনে যেসব সুযোগ আসে তার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ অর্জন করতে, আমাদের যা-কিছু সহায়-সম্বল আছে তার প্রতি আধ্যাত্মিকভাবে অনাসক্ত হতে এবং আমাদের যা নেই তার জন্য দুঃখ ও বেদনাবোধ পোষণ না করতে শেখায়। যার অর্থ হলো কর্তৃত্বের বাহাদুরী এবং উদ্দেশ্যবিহীন আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা। বর্তমান নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের ঢেউ-তরঙ্গ যেন আমাদের হৃদয়মনকে প্লাবিত করতে না পারে এবং যা-কিছু নেই তার সন্ধানে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস ত্যাগ করে একটি প্রত্যয় অন্তরে লালন করতে পারি- "কমই হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বেশি।" তবেই জীবনকে বেশি করে ও অধিকতর তৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করতে সক্ষম হবো *(লাউদাতো সি ২২২-২২৩)*। জীবনকে সমৃদ্ধ করার অর্থ- চরম ভোগবাদ বর্জন করে নিষ্প্রয়োজন বেচা-কেনার চক্রে ফেঁসে না গিয়ে প্রয়োজন মাফিক কেনাকাটা করা; যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকু খাবার রান্না, পরিবেশন ও পরিমিত ভোগ করা; জিনিসপত্র পুনর্ব্যবহার করা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচপাতি বর্জন করা; জিনিসপত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার না করা; ভোজনবিলাস ও অতি ভোগের মানসিকতা বর্জন করা; বাড়িতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিভিশন, এসি, পানির কল, বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের পর বন্ধ রাখা ও অন্যকে সচেতন করা। একেবারে রিক্ততা জীবনের জন্য বেদনাদায়ক, আবার বহুলতায় সত্যিকারে আনন্দ হারিয়ে যায় কিন্তু বৈচিত্র্যের মাঝে জীবনের মূল ভাবটি খুঁজে পাওয়াই সুন্দরতম দিক।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে অন্তরের শান্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত কেননা ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের মধ্যে স্থান পায় এমন বিস্ময়বোধ যেখানে জীবন সম্পর্কে গভীরতর বোধশক্তি বিদ্যমান থাকে। অবিরাম গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খল পরিবেশ, একটানা পীড়াদায়ক মানসিক অবস্থা, সাজপোশাকের জৌলুস, লাগামহীন ভোগবিলাস, জীবনের গভীর ভারসাম্যহীনতা, পাগলের ন্যায় কর্মব্যস্ততা, ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকা, পদ-পদবী নিয়ে দুর্ভাবনা, আচরণে প্রতিনিয়ত তারাহুড়োভাব, উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় চলাফেরা করলে আশেপাশের সবকিছুই ভাসাভাসা ও হাল্কাভাবে দেখতে শুরু করবো। পরিবেশ সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সময় নিয়ে সৃষ্টিকে অবলোকন করা, আমাদের জীবনযাত্রা ও আমাদের আদর্শ নিয়ে ধ্যান করা, এবং সৃষ্টিকর্তা যিনি আমাদের মধ্যেই বাস করেন আর

আমাদেরকে সস্নেহে আগলে রাখেন সেই তাঁকে নিয়ে গভীর ধ্যান মগ্ন থাকা, তাঁর উপস্থিতি আবিষ্কার করা ও তাঁকে পেতে উন্মুক্ত থাকা *(লাউদাতো সি ২২৬)*। তাই যিশু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন- মাঠের লিলিফুল ও আকাশের পাখিদের নিয়ে ধ্যান করতে আবার তিনি ধনী যুবকের অস্থিরতার কারণও ধ্যান করতে বলেছেন *(মার্ক ১০:২১)*। যিশু কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে মায়ের অনুরোধ ও ভোজকর্তার মনের অবস্থা অনুভব করেছেন, সাগরে ঝড়ের মাঝে বিদপগ্রস্ত নৌকাতে শান্ত ছিলেন, তাঁর বাণী শুনতে আসা অভুক্ত লোকদের দিকে তাকিয়ে তাঁর অন্তর মমতায় ভরে উঠেছে, উদ্ধত সমাজপতিদের ক্ষুব্ধ প্রশ্নের উত্তর তিনি শান্তভাবে দিয়েছেন, আসন্ন দুঃখকষ্ট স্মরণ করে মর্মাহত হয়েও গেৎসিমানি বাগানে পিতার ইচ্ছা গ্রহণ করেছেন এবং এসবই আমাদেরকে জীবন সম্পর্কে গভীরতর বোধশক্তিই শিখায়।

৭. পোপ ফ্রান্সিস একটি ইতিবাচক মনোভাব ও অভ্যাসের প্রতি সকলেকে মনোযোগ দিতে বলেছেন- আমরা খাবারের আগে ও পরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। এই অতি সুন্দর ও অর্থপূর্ণ রীতিটি পালনের অভ্যাস চলমান রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছেন। আশীর্বাদ যাচ্না সময়টি সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমাদের জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, অভ্যাসটি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার মনোভাবটি জোরদার করে, যারা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে শেখায়, এবং যারা সবচাইতে বেশি অভাবী তাদের সাথে আমাদের একাত্মতা পুনরায় ব্যক্ত করতে শিখি *(লাউদাতো সি ২২৭)*। আমাদের একটি গৃহ হল ধরিত্রী এবং দ্বিতীয়টি নিজের দেহ। এই দুটির প্রতি যত্নবান হওয়া আমাদের খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতার অংশ; আবার আমাদের দেহ হল ঈশ্বরের মন্দির। আমরা কিছু বিষয় যেমন- ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহার, মাদকদ্রব্য ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশনা এবং এরূপ বহুবিধ ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য আহার ও পানীয় পান করা, শাকসবজি, ফুল ও ফলের বাগান করা এবং খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। পরিমিত মাংস গ্রহণ, সকল খাদ্যদ্রব্য পরিমিত পরিবেশন ও পরিমিত ভোগ; যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাবারই রান্না করা, দেশীপণ্য ব্যবহার এবং এসব অভ্যাস আরো বাড়াতে পারি।

৮. পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন- ভাল মানুষ হওয়া ও ভদ্র আচরণ করাটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যা আমাদেরকে শেখায় পরস্পরকে আমাদের প্রয়োজন এবং অপরের প্রতি ও জগতের প্রতি আমাদের অভিন্ন দায়িত্ব পালনের অনুপ্রেরণা যোগায়। ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পথ ছিল- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালোবাসার কাজ, একটি সান্ত্বনার বাণী, সস্নেহ মৃদু হাসি, বন্ধুত্বের বীজ বুনতে পারে এমন ছোট একটি কথা। পরিবেশ সংরক্ষণের ধারায় থাকে এমন জীবনধারার সহজসরল হাসিখুশি ভাব যা সন্ত্রাসকে দূরে রাখে, নিজের স্বার্থে অপরকে ব্যবহার করা মনোভাব বর্জন করে। খ্রিস্টমণ্ডলী জগতের সামনে "ভালোবাসার সংস্কৃতি বা সভ্যতা" গড়ে তোলাকে একটি আদর্শ হিসেবে রেখেছেন যাতে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগে বৃহত্তর কর্মপন্থা আবিষ্কার করা যায় এবং গোটা সমাজ উদ্বুদ্ধ হয় এমন "যত্নবান হওয়া সংস্কৃতি" প্রতিষ্ঠা করা যায় *(লাউদাতো সি ২২৮-২৩১)*। নিজের দেহ থেকে শুরু করে জামাকাপড়, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল, সমাবেশস্থল প্রভৃতির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; সমন্বিত পরিবেশ সংক্রান্ত অবনতি রোধকল্পে সমাজ উপকৃত হবে এমন 'যত্নবান হওয়ার সংস্কৃতি' অনুশীলন করতে পারি। যদি আমরা আমাদের ভাইবোনদের জন্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের যত্নবান হতে ইচ্ছা করি তবে অপরের জন্য নিঃস্বার্থ দরদবোধ থাকা এবং সব ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মমগ্নতা প্রত্যাখ্যান করা একান্তই অপরিহার্য *(লাউদাতো সি, অনুচ্ছেদ ২০৮)*।

৯. খ্রিস্টপ্রসাদের রুটিতে গোটা সৃষ্টিই দৈবায়নের দিকে, পবিত্র বিবাহ-উৎসবের দিকে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সাথে একাত্ম হওয়ার দিকে পরিচালিত হয়ে। পোপ মহোদয় বলেছেন-খ্রিস্টপ্রাসাদ হলো একই সময়ে আলোর উৎস এবং পরিবেশের জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রেরণা, যার মধ্যে গোটা সৃষ্টির দেখাশোনা করার ও যত্ন নেওয়ার নির্দেশ আছে *(লাউদাতো সি ২৩৫-২৩৬)*। খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় বিশ্রাম ও আনন্দোৎসবের গুরুত্ব নিহিত, ধ্যানমগ্নতায় বিশ্রামকে অনুৎপাদনশীল ও নিষ্প্রয়োজন বলা ঠিক নয় বরং যা আমাদের সত্তারই অংশবিশেষ ও নবায়ন করে থাকে। পবিত্র গ্রন্থে বলা হয় বিশ্রামবারে সবকিছু বিশ্রাম পাবে ও সবাই পরিশ্রম থেকে রেহাই পাবে (যাত্রা ২৩:১২)। বিশ্রামের ফলে আমাদের দৃষ্টিবোধ উন্মুক্ত হয় ফলে অপরের অধিকার, জগতের আর্তনাদ ও দীন-দরিদ্রদের আর্তনাদে আমাদের দায়বোধকে জাগ্রত ও অনুপ্রাণিত করে।

১০. বিশ্বজগতের মা মারীয়া, তিনি দীনদরিদ্রদের কষ্টে ও ক্ষতবিক্ষত জগতের সকল প্রাণীর জন্য দুঃখশোকে কাতর। আমরা তাঁর নিকট সবিনয় প্রার্থনা করতে পারি যেন তিনি আমাদেরকে প্রজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখার শক্তি দেন। নাজারেথের পবিত্র পরিবারের রক্ষাকর্তা সাধু যোসেফ যাকে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর রক্ষাকর্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছে তিনিও আামদের শেখাতে পারেন- কিভাবে সেবাযত্ন দিতে হয় এবং ঈশ্বরের উপহার আমাদের অভিন্ন বসতবাটি রক্ষা করার জন্য উদারভাবে পরিশ্রম করতে তিনি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আমরা এখন অনন্তকালীন বিশ্রামের দিকে, নতুন জেরুশালেমের দিকে, স্বর্গে আমাদের অভিন্ন আবাসগৃহের দিকে যাত্রা করছি। যিশু বলেন- "আমি এখন সব-কিছুই নতুন করে তুলছি" *(প্রত্যাদেশ ২১:৫)*। এই গ্রহটির জন্য আমাদের ভাবনা-চিন্তা যেন আমাদের প্রত্যাশার আনন্দ বিনষ্ট করতে না পারে। সৃষ্টিকর্তা যাত্রাপথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে-আলো ও শক্তি প্রয়োজন তা আমাদের প্রতিনিয়ত উদারভাবে দান করছেন। তিনি আমাদের মাঝে নিত্য উপস্থিত, কখনো পরিত্যাগ করেন না, একা ফেলে রেখে যান না। তিনিই আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন এবং তাঁর সেই ভালোবাসা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পথ ও পন্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দান করছেন, আসুন ধ্যান-প্রার্থণায় তা শুনি ও এখনই কাজে সক্রিয় হই *(লাউদাতো সি ২৪৩-২৪৫)*। তোমার প্রশংসা হোক- লাউদাতো সি॥ ৯

মুঘলচিত্রকলায় শিশুযিশু ও কুমারী মারীয়া

প্রদীপ পেরেজ এস জে

প্রেক্ষাপট

যিশুখ্রিস্ট ও খ্রিস্টধর্মের বিষয়ে জানার জন্য মুঘলসম্রাট জালাল উদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৪২–১৬০৫) খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাই ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি গোয়ার জেজুইট প্রভিন্সিয়ালকে অনুরোধ জানান যে, 'খ্রিস্টধর্মবিষয়ক প্রধান প্রধান পুস্তকসমেত দুইজন ধর্মত্ত্ববিদ ও প্রাজ্ঞ জেজুইট পণ্ডিতকে' যেন তাঁর দরবারে প্রেরণ করা হয়। মুঘল অধিপতির চিঠি পেয়ে যিশুসঙ্গীরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, আকবর হয়তো খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেবেন এবং সাম্রাজ্যের সবাইকে রাজধর্মের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসবেন। সেই প্রত্যাশায় ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর ফাদার রুদল্‌ফ আকুয়াভিভাকে প্রধান করে ফাদার আন্তোনিও মঁসেরাত ও ব্রাদার ফ্রান্সিস হেনরিক্সকে মুঘল মিশনে পাঠানো হয়। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি এই তিন যিশুসংঘী ফতেপুর সিক্রিতে আকবরের দরবারে উপনীত হন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ৩ মার্চ ফাদার রুদল্‌ফ আকুয়াভিভা এসজে সম্রাট আকবরকে ফতেপুর সিক্রির প্রাসাদে চিত্রসম্বলিত একটি বাইবেল প্রদান করেন। সেই বাইবেলে নানা চিত্রের মধ্যে শিশুযিশু ও কুমারী মারীয়ার ছবি ছিল। বলা যায় আকবরের দরবারে খ্রিস্টীয় বিষয়বস্তুর সেটাই প্রথম কোনো মিনিয়েচার চিত্রশিল্প। মধ্যযুগের ইউরোপে মহাগ্রন্থের মধ্যে ছোট ও সূক্ষ্ম ছবি দিয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করার রীতিকেই 'মিনিয়েচার পেইন্টিং' বা 'ছোট চিত্র' কিংবা অনুচিত্র বলা হয়। সেই ধারায় পরবর্তীকালে মুঘল আমলেও বিভিন্ন গ্রন্থে অনেক অনুচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে মুঘল মিনিয়েচার ইউরোপ, পারস্য, তুর্কি ও চীনা– চিত্রশিল্পের দ্বারা প্রভাবিত। এই ধারা একসময় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে অনন্য ও অভিনব নান্দনিক এক চিত্র মাধ্যমরূপে সুবিদিত ও সমাদৃত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় চিত্রকলায় মুঘলসম্রাটদের আগ্রহ

মুঘল শাসনকালে প্রায় ৪০০ চিত্রশিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুন শিল্পের প্রতি অনুরাগী হলেও চিত্রশিল্পের চর্চা ও সর্বোচ্চ ব্যাপ্তি ঘটে সম্রাট আকবরের আমলে। সম্রাট আকবর ছিলেন শিল্পের সমঝদার। বহু বিষয়ে আগ্রহী আকবর তরুণ বয়সে শিল্পের পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর দরবারে প্রায়

১০০ জন চিত্রশিল্পী নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি নিজে তাঁর শিল্পচর্চার কেন্দ্রগুলো দেখাশুনা করতেন। আকবরের উত্তরসূরি সম্রাট জাহাঙ্গীরও (১৫৬৯–১৬২৭) শিল্পকলার সার্থক অনুরাগী ও বোদ্ধা হিসাবে পরিগণিত এবং চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য। তিনিই এই ভারতবর্ষে ইউরোপীয় চিত্রকলার যথাযথ অনুবর্তন ঘটানোর পথিকৃৎ। তাঁর আমলেই ভারতবর্ষে ইউরোপীয় চিত্রকলার সবচেয়ে বেশি অনুকরণ দেখা যায়। তিনি তাঁর প্রাসাদশিল্পীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁরা যিশু ও মারীয়ার ছবি ইউরোপের পটুয়াদের মতোই উপস্থাপন করেন। তিনি নিজেও ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সর্বজনীন বিষয়ের চিত্রাঙ্কনে ইউরোপের ধারা অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, পাশ্চাত্যের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পের চেয়ে আরও উচ্চতর অবস্থানের। পরবর্তীকালে মুঘল সাম্রাজ্যে পরধর্মসহিষ্ণুতা লোপ পায়; সেইসঙ্গে খ্রিস্টীয় চিত্রচর্চার আয়োজনও স্তিমিত হয়ে যায়।

আকবরের দরবারশিল্পীদের মধ্যে কেসু দাস, মনোহর, বাসাওয়ান, কেসু খুর্দ এই চারজন ছিলেন খ্রিস্টীয় চিত্রকলা অঙ্কনের পথিকৃত এবং একইসঙ্গে সবচেয়ে নামকরা। জাহাঙ্গীরের আমলে আবুল হাসিম এবং আবুল হাসান ছিলেন অন্যতম শিল্পী। তাঁদের শাসনামলে মুঘল দরবারে নারী চিত্রশিল্পীদেরও উপস্থিতি ছিল। তাদের মধ্যে নাদিরা বানু, শাহিকা বানু, রোকেয়া বানু– প্রমুখ তাঁদের ছবিতে মারীয়া ও তাঁর শিশুপুত্রের অভিব্যক্তি অত্যন্ত দরদ দিয়ে প্রাণবন্ত ও সুচারুরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুঘলচিত্রকলা চর্চায় যিশুসংঘীদের অবদান

ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের মধ্যে জেজুইট ফাদারগণই প্রথম মুঘল দরবারে আগমন করেন। সম্রাট আকবরের আমন্ত্রণে যিশুসংঘী যাজকগণ তিনবার ধর্মপ্রচারের লক্ষ্যে দরবারে গমন করেন। আকবর চেয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্মের মর্মসত্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নিতে। অন্যদিকে জেজুইটদের স্বপ্ন ছিল সম্রাটকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা। তাই মুঘল দরবারের যিশুসঙ্গীদের তৃতীয় প্রচার-প্রচেষ্টার

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

প্রধান পুরোহিত ফাদার জেরোম জেভিয়ার এস জে (১৫৪৯-১৬১৭) ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের ওপর ভিত্তি করে পারিসক ভাষায় 'মিরাত আল-কাদস্' যার সম্পূর্ণ বাংলা তর্জমা 'পবিত্রতার আয়না: আকবরের জন্য যিশুখ্রিস্টের জীবনী' নামে যিশুখ্রিস্টের জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেখানে খ্রিস্টীয় বিষয়বস্তু নিয়ে বেশকিছু ছবি সম্বলিত হয়। সেই মহাগ্রন্থ এতোই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে শীঘ্রই তার অনুলিপি প্রকাশিত হয়। পেদ্রো মুরা কার্ভালো তাঁর 'মুঘল চিত্রকলা: শিল্প ও কাহিনি' নামক বইয়ে ফাদার জেরোমের রচিত গ্রন্থের ১৯টি অনুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন। সেসব গ্রন্থের তিনটি বাদে সবগুলোতেই ১৭ থেকে ২৭টি চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে ফাদার আন্তোনিও মঁসেরাত এবং পরে ফাদার জেরোম জেভিয়ার দরবারি দিনলিপি ছাড়াও খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও বিষয়বস্তু নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যদিও সম্রাটকে ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টায় জেজুইটদের অভিসন্ধি সার্থক হয়নি, তবে খ্রিস্টীয় চিত্রকলার প্রচার ও প্রসারে তাদের প্রচেষ্টা ও রচনাসমূহ মাইলফলক হিসাবে পরিগণিত। আকবর এবং শাহাজাদা সেলিম (পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীর) দুজনই আগ্রা ও এলাহাবাদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ চিত্রকর্মশালা নির্মাণে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাঁদের দুজনেরই খ্রিস্টীয় ছবির উৎস হিসাবে হাতে ছিল ফাদার জেরোম জেভিয়ার রচিত 'যিশুর জীবনী'। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে প্রাপ্ত সেই জীবনীগ্রন্থে লেখনী ছিল ১৬০ পৃষ্ঠা এবং সেখানে আঁকা ছবি ছিল ২৪টি। তবে গ্রন্থটি ছিল খণ্ডিত। উল্লেখ্য সাধু ইগ্নাস লয়োলার অনুপ্রেরণায় তার একান্ত সচিব ফাদার জেরোম নাদাল এসজে যিশুর জীবনের নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ অনুধ্যাণের অভিপ্রায়ে শিল্পী জন বাতিস্তা ফিয়াম্মেরি, বেরনার্দো দে পাসেরি, মার্টিন দে ভস- প্রমুখের অঙ্কন ও অলঙ্করণে 'মঙ্গলসমাচারীয় ইতিহাসের চিত্রকল্প' শিরোনামে এক চিত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থেরই ভাবানুসারে রচিত ও চিত্রিত হয় ফাদার জেরোম জেভিয়ারের 'যিশুর জীবনী'। তবে সম্রাট আকবরের কাছে প্রাপ্ত ও সুরক্ষিত তার ব্যক্তিগত সীলসহ 'যিশুর জীবনী' গ্রন্থটির কারণেই খ্রিস্টীয় চিত্রকলা ভারতে ও বহিঃবিশ্বে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মুঘল দরবারে যিশুসঙ্গীদের অনন্য মর্যাদা ছিল। ধর্মালোচনায় সম্রাট আকবর তাদের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হতেন। তাদের প্রতি সম্রাটের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্ব ছিল। এমনকি ফাদার আন্তোনিও মঁসেরাত অনেকদিন শাহাজাদা সেলিম ও মুরাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেলিম যখন জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি স্বভাবতই তার শিক্ষকদের সম্মানের চোখে দেখতেন। খ্রিস্টধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর আমলে খ্রিস্টীয় চিত্রকলা মুঘল দরবারে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করে। শুধু ইউরোপীয় চিত্রের অন্ধ অনুকরণ নয়, সেসব চিত্রাবলীতে ভারতীয় মেটিফ অন্তর্ভূক্ত করার এসং সেগুলোকে খ্রিস্টীয় তত্ত্ব-দর্শনের আলোকে উপস্থাপন করার ব্যাপারে তিনি কোনো আপোষ করেননি। সেসব ছবির ঐশতত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্ত ও সুরক্ষিত করার লক্ষে তিনি জেজুইট ফাদারদের কাছ থেকে পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের জন্য তার চিত্রকরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুঘলদরবারে যিশুসঙ্গীদের প্রচারকাজের সার্থক গবেষক এডোয়ার্ড ম্যাকলাগান তাঁর 'যিশুসঙ্গী ও মহান মুঘল' নামক গ্রন্থে দরবারে খ্রিস্টীয় ছবির উপস্থিতি ও উপযোগিতায় যিশুসংঘের ফাদারদের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, "আকবরের দরবারে জেজুইট ফাদারদের ধর্মীয় অবস্থান ও প্রবণতার কথা বিবেচনা করে এবং তাদের কর্মধারার যথাযথ বিশ্লেষণে আমরা সুনিশ্চিত সত্যে উপনীত হতে পারি যে, তাঁরাই সেখানে ইউরোপীয় তথা খ্রিস্টীয় চিত্রকলা সরবরাহে একচেটিয়া ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।"

শিশুযিশু ও মারীয়ার প্রতি মুঘল সম্রাটদের আনুগত্য

যে-কোনো ধর্মীয় কাহিনি ও চরিত্রের চিত্ররূপায়ণে আকবরের আগ্রহ ছিল। বস্তুত তার প্রেরণা ও প্রচেষ্টায়ই ভারতীয় চিত্রকলার বহুল পরিচিত ও সুনির্দিষ্ট আঙ্গিক 'মুঘল চিত্ররীতি' বলে ব্যাপক পরিচিতি পায়। ইসলামধর্মে চিত্রাঙ্কন নিষিদ্ধ। তবে সম্রাট আকবর আবেগের চেয়ে যুক্তির ওপর নির্ভর করে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আবুল ফজল রচিত 'আকবরনামা' গ্রন্থে এই সম্পর্কে সম্রাটের একটি উদ্ধৃতি আছে। সেখানে তিনি বলেছেন, "যারা চিত্রকলাকে ঘৃণা করে আমি তাদের অপছন্দ করি। আমার মতে চিত্রকরের পক্ষে ঈশ্বরকে জানার একটা স্বকীয় উপায় আছে। চিত্রকর যখন এমন কিছু আঁকতে যায় যার প্রাণ আছে, তখন সে জীবনদাতা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করে, তার জ্ঞান বর্ধিত হয়।" তবে ধর্মীয় ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের বিষয়বস্তু সুকৌশলে গ্রহণ করেছেন। আমরা জানি পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় চিত্রকলায় কুমারী মারীয়া ও যিশুর ছবি সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। ইউরোপে এমন কোনো বিখ্যাত চিত্রকর নেই, যিনি ম্যাডোনা আঁকেননি। সেই একই ধারার অনুবর্তন দেখি মুঘল আমলের চিত্রকলায়। এডোয়ার্ড ম্যাকলাগান বলেছেন, "মুঘল দরবারে খ্রিস্টীয় ভাবধারাসমৃদ্ধ চিত্রকলাচর্চার সবচেয়ে সুন্দর ও সার্থক উদাহরণ হচ্ছে পুণ্যবতী কুমারী মারীয়া ও শিশুযিশুর ছবি।"

আমরা জানি, জেজুইট ফাদারগণ আকবরকে কুমারী মারীয়ার ছবি ও চিত্রসম্বলিত বাইবেল উপহার দিয়েছিলেন। সেই বাইবেলের মধ্যে যিশু ও মারীয়ার ছবি দেখে তিনি এতোই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই ছবির সামনে জানুপাত করে একবার খ্রিস্টীয় রীতিতে, একবার মুসলমান ধারায় আর একবার হিন্দু ঐতিহ্যে প্রণাম জানান। এই কাহিনী আমরা ফাদার মঁসেরাতের লেখনী থেকে জেনেছি। তিনি প্রথম ইউরোপীয় যে পূর্ণাঙ্গ ছবির সংস্পর্শে আসেন সেটি ছিল যিশু ও মা-মারীয়ার একটি তৈলচিত্র। যিশুর জননীর প্রতি সম্রাটের ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা সুবিদিত। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে ফাদার আন্তোনিও মঁসেরাত এসজে কুমারী মারীয়ার ছবি দেখার পর সম্রাট আকবরের অভিব্যক্তি ও উপলব্ধির প্রসঙ্গে তাঁর 'ভাষ্যলিপি'তে লিখেছেন, "আমাদের বাসগৃহে প্রবেশ করে তার পরিপটি অবস্থা সম্রাট দেখে খুবই অবাক হলেন। চ্যাপেলে মা-মারীয়ার ছবির সামনে গিয়ে তিনি প্রণাম করলেন। সেখানে মা-মারীয়া ও শিশুযিশুর আরেকটি ছবি ছিল, ফাদার মার্টিন দা সিলভা রোম থেকে এনেছিলেন। সেটা দেখার পরও তিনি তার সৌন্দর্যের সুবিশেষ প্রশংসা করেন। এমনকি বাইরে অপেক্ষমান তাঁর সেনাপ্রধানদের কাছে ফিরে গিয়েও মারীয়ার স্বর্গীয় সুষমার তারিফ করলেন। সেই ছবি দেখে তিনি এতোই আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন যে, কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এলেন। এবার সঙ্গে নিয়ে এলেন তার কয়েকজন অনুচর। এছাড়াও তিনি তাঁর প্রধান চিত্রশিল্পীসহ আরও বেশ কয়েকজন দক্ষ

শিল্পীদেরও নিয়ে গির্জায় প্রবেশ করলেন। তারা সবাই মা-মারীয়ার সেই ছবি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। সবাই বলাবলি করতে লাগলেন যে, এতো নিখুঁত ও জীবন্ত ছবি তারা আগে কেউই কখনও কোথাও দেখেননি। এমনকি তাদের মনে হয়েছে সেই ছবির শিল্পীর চেয়ে মহান ও মহৎ কোনো চিত্রকর পৃথিবীতে নেই।"

একসময় ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবর জেজুইট ফাদারদের জন্য একটি সুরম্য বাসগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। সেখানকার চ্যাপেলটিও ছিল চমৎকার, সুন্দর সাজসজ্জায় পরিপূর্ণ। ফাদার আন্তোনিও মঁসেরাত 'ভাষ্যলিপি'তে লিখেছেন, "যিশুর পুনরুত্থান পর্বের পরে ফাদারগণ তাদের পুরাতন বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে আগমন করেন। পুরনো আবাস ছোট ছিল বলে সম্রাট নিজের উদ্যোগে তার প্রাসাদের কাছেই তাদের জন্য আরামদায়ক ও কারুকার্যখচিত একটি আবাসগৃহ বানিয়েছিলেন। সেই বাড়িতে ফাদারদের থাকার খবর পেয়ে আকবর নিজেই একদিন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি সরাসরি চ্যাপেলে প্রবেশ করলেন। মাথার টুপি খুলে কুমারী মারীয়া ও যিশুর ছবির সামনে গিয়ে আষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তারপর তিনি ফাদারদের সঙ্গে ঐশতত্ত্বের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তার এক সপ্তাহ পরে আকবর পুনরায় তার তিনজন শাহাজাদাকে এবং কয়েকজন অমাত্য নিয়ে পুনরায় যিশুসংঘ সদনে এলেন। তিনি নিজে পায়ের জুতা খুলে গির্জিকায় প্রবেশ করলেন। সবাইকে তা-ই করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি যিশু ও মারীয়াকে প্রণাম করার জন্য শাহজাদাদের আদেশ দিলেন। সম্রাটের অমাত্যদের একজন পুণ্যবতী মারীয়ার ছবি ও তার স্বর্গীয় সুষমা দেখে গভীর আধ্যাত্মিক সন্তোষ প্রকাশ করলেন।" সেদিন ফাদারগণ রোম থেকে আনা কুমারী মারীয়ার একটি ছবি ফাদার প্রভিন্সিয়ালের নামে আকবরকে উপহার দেন।

সমসাময়িক লেখা ও বর্ণনায় যিশু এবং মারীয়ার ছবি

সম্রাট আকবরের সর্বধর্মসহিষ্ণু মনোভাব এবং তার দরবারে যিশুসংঘী যাজকদের উপস্থিতি ও প্রচারপ্রচেষ্টা পাশ্চাত্যের অনেক পর্যটক ও লেখক-বিশ্লেষকদের তার দরবারে নিয়ে এসেছে। তাদের লেখনী ও পত্রাবলি থেকে আমরা সেই সময় ও কাজের সম্যক ধারণা পাই। মুঘল দরবারে জেজুইট ফাদারগণও বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। নানা সময়ে তাঁদের কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক চিঠিপত্র লিখেছেন। সেগুলো সবই ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ উপাদান। তেমনি নানা গ্রন্থ ও পত্রাদি মুঘল দরবারে খ্রিস্টীয় চিত্রকলা, মূলত বড়দিন বিষয়ক বিভিন্ন ছবি সম্বন্ধে যথার্থ তথ্য পরিবেশন করে।

ফাদার ফেরনাও গেরেইরো এসজে ১৬০০ থেকে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল দরবারে ছিলেন। তিনি লিখেছেন, সম্রাট আকবরকে উপহার দেবার আগে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে মূল ছবিটি সুরাট শহরের জেজুইট হাউজে ১৩ দিন ধরে প্রদর্শিত হয়। সেটি দেখার জন্য সেই সময়ে প্রায় ১৩ হাজার মানুষ ভিড় করে। ফাদার লুই দ্য দিও এসজে (১৫৯০ – ১৬৪২) মুঘল দরবারে ফাদার জেরোম জেভিয়ারের লেখা বহুল আলোচিত 'যিশুর জীবনী' ও 'সাধু পিতরের জীবনকথা' নামক দুটো গ্রন্থ মূল পারসিক ভাষা থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। সেসব গ্রন্থের টীকাভাষ্য রচনায় তিনি ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে শিশুযিশু ও মা-মারীয়ার ছবি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আগস্টিনীয় যাজক সেবাস্তিয়ান মানরিক আগ্রা দরবারের অভ্যন্তরীণ দেয়ালে যিশু ও মারীয়ার ছবি দেখার কথা লিখেছেন। তিনি প্রায় ২৭ দিন বঙ্গদেশে ও ঢাকায় অবস্থান করেন। পরবর্তীকালে নিকোলো মানুচি নামক একজন ভেনিসীয় পর্যটক ফতেপুর সিক্রির জেজুইট হাউজের বাগানে প্রবেশপথে ডানদিকের দেয়ালে মা-মারীয়ার কোলে যিশুর ছবির কথা তাঁর লেখনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জেজুইট হাউজের ঘর ও বারান্দার ছাদের ভেতরের দিকে স্বর্গদূতের বহু ছবির কথা বলেছেন। মানুচি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে বঙ্গদেশ এবং ঢাকা পরিভ্রমণ করেন। ফাদার দানিয়েল্লো বার্তোলি এসজে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'এশিয়ায় যিশুসংঘের ইতিহাস' গ্রন্থে মুঘল দরবারে খ্রিস্টীয় চিত্রকলার, বিশেষত কুমারী মারীয়া ও শিশুযিশুর বেশ কয়েকটি ছবির উল্লেখ করেছেন। 'মুঘল দরবারে যিশুসংঘের যাজক রুদলফ্ আকুয়াভিভার প্রচারকর্ম' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে জেজুইট প্রচারকর্মের এক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।

শুধু সম্রাটকে দেওয়া উপহার থেকেই যে মুঘল আঁকিয়েরা ধারণা পেয়েছেন তা নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জেজুইট ফাদারদের গৃহস্থালিতে শোভিত খ্রিস্টীয় ছবি থেকেও তারা চিত্ররসদ নিয়েছেন। ফাদার জেরোম জেভিয়ারের লেখা 'যিশুর জীবনী' গ্রন্থে সঙ্কলিত একটি ছবিতে দেখা যায় যে, বেথলেহেমের একটি পরিষ্কার ঘরে সন্তান-সম্ভাবা মারীয়া যিশুর জন্মের প্রহর গুনছেন। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ সরকারি গ্রন্থাগারে মুঘল দরবারের এক চিত্রকর্মে মারীয়া ও শিশুযিশুর ছবির নিচে পারসিক ভাষায় লেখা আছে 'ইয়া সাহিব-উল-জামান', অর্থাৎ 'ইনিই সর্বযুগের মহাপ্রভু'। অনুরূপভাবে বার্লিনে জার্মানির সরকারি গ্রন্থাগারে মুঘলচিত্র মারীয়া ও যিশুর ছবির নিচে লেখা 'তসবির হযরত ইসা বিন মরিয়ম', অর্থাৎ কুমারী মারীয়ার পুত্র প্রভু যিশুর ছবি'। একটা ছবিতে দেখা যায় জাহাঙ্গীরের হাতে একটি পবিত্র ক্রুশ ধরা আছে। আরেকটি ছবিতে তার পিতা আকবরের হাতে পুণ্যবতী কুমারী মারীয়ার ছবি রয়েছে। জাহাঙ্গীরের দরবারের সর্বত্রই কুমারী মারীয়া ও শিশুযিশুর ছবি টাঙানো থাকতো। এমনকি তাঁর সিংহাসনের কাছে এমন বেশ কয়েকটি ছবি থাকার কথা জানিয়েছেন মুঘল দরবারের পরিব্রাজকেরা। আকবর ও জাহাঙ্গীরের পরেও মাত্র কয়েকজন মুঘলশাসক খ্রিস্টধর্মের ছবি অঙ্কনে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মাহমুদ শাহ।

মুঘলদরবারে বড়দিন উদ্‌যাপন

মুঘলদরবারে সম্রাটদের প্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মহাড়ম্বরে বড়দিন পালিত হতো। বড়দিনের গোশালা বানানো, যিশুর জন্মকাহিনীর অভিনয়, জাকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রাসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ফাদার জেরোম জেভিয়ারের পত্রাবলি থেকে আমরা মুঘল দরবারে খ্রিস্টবাণী প্রচার ও সেখানে সম্রাটদের সঙ্গে বড়দিন পালনের বিস্তারিত বর্ণনা পাই। তিনি ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি গোয়াস্থ যিশুসংঘের অধ্যক্ষের কাছে এক পত্রে লেখেন, "বড়দিনের সময় ব্রাদার বেনেডিক্ট গমেজ আমাদের যাজকভবনে একটি গোশালা বানিয়েছেন। সেটি গোয়ায় নির্মিত গোশালার মতোই চমৎকার এবং আকর্ষণীয় ছিল। তবে যাবপাত্রের আদলে তৈরী দোলনায় শিশুযিশুর মূর্তি প্রতিষ্ঠাপন করার পর সেটি দেখার জন্য শুধু খ্রিস্টভক্তরাই নন, হিন্দু-মুসলমানসহ সব বিধর্মীরাই ভিড় করতে লাগল। তাদের সবার মধ্যেই আনন্দ-উৎসাহের সাড়া পড়ে গেল। বড়দিনের

সন্ধ্যারাতের খ্রিস্টযাগ মহাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হল। পারসিক ও স্থানীয় ভাষায় যিশুর জন্মের কাহিনি অভিনীত হল। প্রার্থনার পর আমাদের বাসগৃহের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো। প্রতিদিনই শত শত মানুষ সেই গোশালা ও যিশুর জন্মাভিনয় দেখতে আসত। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আটদিন অর্থাৎ যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে হলো। আকর্ষণীয় সেই প্রদর্শনীর কথা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল। বহু মানুষ আমাদের প্রভু যিশুর জন্মকাহিনি সম্বন্ধে ধারণা পেল।"

১৬০৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর ফাদার জেরোম জেভিয়ার আগ্রা থেকে এক চিঠিতে সেখানকার যিশুসঙ্গী ও খ্রিস্টভক্তদের ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "অন্যান্য বছরের মতো বিগত বড়দিনেও সুন্দর এক শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সবার হাতে ছিল ব্যানার ও ফেস্টুন। তাতে পারসিক ভাষায় লেখা ছিল 'জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়' এবং আঁকা ছিল কুমারী মারীয়া ও শিশুযিশুর ছবি। সত্যিই, আমাদের জনগণের ভক্তি-বিশ্বাস প্রকাশে সেটা ছিল এক প্রশান্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। অনেক মুসলমান এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষও সেই শোভাযাত্রা দেখতে ভীড় করেছিল।" ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চে লেখা আরেকটি পত্রে ফাদার জেরোম জেভিয়ার বড়দিনের গোশালা ও সাজসজ্জার বর্ণনা দেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, "একটি যন্ত্রের শিম্পাঞ্জি বানানো হয়েছিল, যার চোখ-মুখ দিয়ে জল নির্গত হতো। তার উপরের দিকে ছিল একটি পাখি। পাখিটি মাঝে মাঝে আশ্চর্যভাবে মধুর সুরে গান গেয়ে উঠতো। দুটো হাতির পিঠে একটি ভূগোলক স্থাপন করা হয়েছিল। তার ওপরে ছিল সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি ছবি। এই ছবি তিনিই আমাদের পাঠিয়েছিলেন। সম্রাটের ছবির পাশেই ছিল বিরাট একটা আয়না। সেখানে নিশানহাতে অনেক স্বর্গদূতের সঙ্গে ছিলেন মহাদূত গাব্রিয়েল। তাঁদের ঝাণ্ডায় পারসিক ভাষায় লেখা ছিল: 'জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়, ইহলোকে নামুক শান্তি', 'ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই আছেন'– এমনই বাইবেলীয় নানা বাণী। সেইসঙ্গে যিশুর জন্মের বিষয়ে প্রবক্তাদের মুখে উচ্চারিত নানা ভবিষ্যদ্বানীও লেখা ছিল।

মুঘল-ম্যাডোনায় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

খ্রিস্টীয় চিত্রকলা সবসময় সমন্বয় সাধনের অনুসারী। তার আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা সর্বজনীন। প্রথম যখন চীনদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হয়, সেখানে যিশুখ্রিস্ট ও কুমারী মারীয়াকে তাঁরা নিজেদের চেহারা ও আদলে রূপ দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে ভারতীয় চিত্রকলায় যিশু ও তাঁর জননীকে ভারতের মানুষ করে তোলার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা দেখা যায়। আমাদের পরিচিত যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর বেইজ, এমনকি এম এফ হুসেনও খ্রিস্টীয় বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন। তবে আকবরের দরবারের চিত্রশিল্পীগণ পাশ্চাত্য রীতিকে অনেকাংশেই অনুসরণ করেছেন। তাঁদের শুরুর সেই সময়ে সামনে কোনো আদর্শ ছিল না। তাই তাঁদের আঁকা যিশু ও মারীয়া ইউরোপ ও ভারতীয় নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে এক নতুন আঙ্গিকের অনুষঙ্গ হয়ে উঠলেন। তবে একথা ঠিক যে, মুঘল দরবারের এসব শিল্পীরা ইউরোপীয় চিত্রাবলীর ভারতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে মুঘলীকরণেও তৎপর ছিলেন। নিজেদের পরিচিত ও যাপিত জীবন ও অনুষঙ্গের প্রতি তাঁদের আগ্রহ ছিল। তাই আমরা বড়দিনের ভাবধারায় অঙ্কিত ছবিতে পাহাড়ি পরিবেশগুলো ইউরোপ ও ভারতের চেয়ে পারস্যের আদলেই দেখি। ছবিতে সাধারণ মানুষ ভারতীয় পোষাক ও অলঙ্কার পরিহিত। সম্ভ্রান্ত মানুষেরা যেন মুঘল সম্রাট ও শাহাজাদা। অন্যদিকে বড়দিনের কাহিনীর তিনজন পণ্ডিতের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁরা ভারতীয় মানুষকে ফুটিয়ে তোলেননি, সেখানে শিল্পিত করেছেন পর্তুগিজ ভদ্রলোকদের। তাঁরা উট নিয়ে এলেন ঠিকই তবে তাঁদের মাথায় ইউরোপীয় টুপি। পোষাকে ষোলআনা পাশ্চাত্য পুরুষ।

তবে কয়েকজন শিল্পী পাশ্চাত্যের আইকনধর্মী ছবির সঙ্গে ভারতীয় জলরঙের সার্থক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সেসব ছবিতে কুমারী মারীয়ার আনন্দমী সত্তা চোখে পড়ে। ছবিতে মারীয়ার সুন্দর মুখাবয়ব এবং শারীরিক অভিব্যক্তি ভারতীয় নারীর আদলেই চিত্রিত। তাঁর কোমল ও সহজ সরল চেহারা যেন এই ভূখণ্ডের নারীর চিরন্তন প্রকৃতি প্রকাশ করে। মারীয়ার কপালে টিপ, সিঁথিতে সিঁদূর, হাতে বালা পলা ও শাখা। এছাড়াও কয়েকটি ছবিতে দেখি মারীয়ার গলায় মঙ্গলসূত্র, হাতে ভারী গয়না, চুড়ি, বালা। কিছু কিছু চিত্রে তাঁর মাথায় টিকলি, গায়ে ওড়না, পায়ে নূপুর ও ঘুঙুর এবং হাত মেহেদির রঙে রঞ্জিত। তিনি যেন লজ্জাবতী ভারতীয় কোনো নারী। সেখানে তিনি সত্যিই যেন এক সম্ভ্রান্ত ঘরের ব্যক্তিত্বময়ী জননী, অবগুণ্ঠিত পদ্মনেত্রে পরম মমতায় তাকিয়ে আছেন কোলের শিশুর দিকে। দুয়েক জায়গায় তিনি ফুল তোলেন, শিশুযিশুকে নিজের মতো ছেড়ে দেন, আবার হাত ধরে রাখেন।

মুঘল চিত্রশিল্পীরা যিশু ও মারীয়ার ছবি আঁকতে গিয়ে ইউরোপীয় রেনেসাঁ-যুগের চিত্রকে যথাযথভাবে আত্মস্থ করেছেন বলেই মনে হয়। ছবিগুলোর চারিদিকে আকর্ষণীয় কারুকার্যখচিত বর্ডার মুঘল চিত্রের বিশেষ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তবুও তার মধ্যে সর্বধর্ম ও কৃষ্টি সমন্বয়ের একটা প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রয়েছে। মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ বাস্তু সংগ্রহশালায় সতের শতকের মুঘল চিত্রকলার বেনামী চিত্রকরের কুমারী মারীয়া ও শিশুযিশুর একটি ছবি আছে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে আঁকা সেই ছবিতে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের পুরোহিতগণ দেবশিশু যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর জননীকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

শেষকথা

মুঘলযুগের আগে বা শুরুতে ছবির মধ্যে শিল্পীর স্বাক্ষর করার রীতি ছিল না। সম্রাট আকবরের সময় থেকে চিত্রের সঙ্গে চিত্রীর নাম ও স্বাক্ষর যুক্ত হতে থাকে। জাহাঙ্গীরের আমলে সেই রীতি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তবুও অনেক পটুয়া বিনয়াবশত তাদের নাম স্বাক্ষর করেননি। তাই ছবির প্রণেতার নাম অজানাই রয়ে গেছে। তাতে বোঝা যায় তারা নিজেদের নাম জাহির করার চেয়ে ছবিতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ও সত্তাকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। এই মনোভাবের ফলে তারা কেউ কেউ হয়তো হারিয়ে গেছেন, তবে শিশুযিশু ও কুমারী মারীয়া তাঁদের সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্বব্যপ্ত সত্ত্বা নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত। প্রতাপশালী মুঘলসম্রাট, খ্রিস্টের প্রেম ও সেবায় নিবেদিত যিশুসঙ্গী যাজক কিংবা নির্মোহ চিত্রশিল্পী– সবাই কালের যাত্রায় একাত্ম হলেও তাঁদের প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাদের সবার জন্যই অনুকরণীয়॥

বড়দিনের একটি গান

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

'বড়দিন' প্রতি বছরেই আসে জীবনকে নতুন করে দিতে। যুগ যুগের প্রতিশ্রুত, নবজাত প্রভু যিশুর মুখটি দেখতে আমরা যাই তাঁর সেই গোয়াল ঘরে। গোয়াল ঘরটি মনে করিয়ে দেয় মানুষের অন্তরের সংকীর্ণতার কথা, দীনতার কথা দুর্বলতার কথা, হিংসার কথা আর অনিশ্চয়তায় ভরা এই ধরণীর করুণ পরিস্থিতির কথা। এই পরিস্থিতিতেই প্রভু যিশু এসেছিলেন মানুষকে নতুন এক পথ দেখাতে; যে পথ ন্যায়ের পথ, যে পথ শান্তির পথ।

প্রভু যিশুর জন্মের সে রাতে মাঠের রাখালেরাইতো তাঁকে প্রথম দেখতে গিয়েছিল। তারাইতো প্রথম শুনেছিল স্বর্গদূতের আনন্দ-জয়গান। আর প্রভু যিশুর মুখটি দেখে, তারা সকলে পেয়েছিল মহা শান্তি।

এই নবজাত যিশু বড় হয়ে যে শিক্ষা দিলেন তা অভিনব। বললেন "শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভলবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।" *(যোহন ১৩:৩৪-৩৫)* ।

'কোভিড-১৯' মহামারি আমাদের দেখিয়ে দিল আমরা মানুষ হিসেবে এখনো কত পিছিয়ে আছি। একটি ন্যায্য সমাজ গড়ার কাজে এখনো আমাদের সম্মুখে কতইনা করার আছে।

নিম্নে প্রকাশিত বড়দিনের গানটি রচনাকালে গোয়াল ঘরে শিশু প্রভু যিশুর মুখটিই বার বার দেখছিলাম। আসুন এই বড়দিনে আবারও আমরা যাই তাঁর গোয়ালঘরে, নতুন চেতনায় জীবন পেতে।

প্রভু যিশু এলেন আজ

প্রভু যিশু এলেন আজ মোদের এ ধরায়
রাখালেরা তাঁর কাছে মহানন্দে যায়।
আকাশের একটি তারা তাদের পথ দেখায়
হৃদয় আমার গোয়াল ঘরের ঐ পথে ধায়।

১। সেথায় এখন আনন্দেতে স্বর্গ দূত গায়
প্রভু যিশুর মুখটি দেখে মানুষ শান্তি পায়।
দলে দলে ভক্তেরা আজ তাঁরই কাছে যায়
প্রভুর প্রেমের স্পর্শে সবার জীবন নতুন হয়।

২। প্রভু যিশু বলেন মোদের আমার শান্তি নাও
সকলেরে ভালবেসে জীবনকে চালাও।
দীন দুঃখী আছে যত সবাইকে বাঁচাও
অটল থেকে. প্রতিদিন ন্যায়পরায়ন রত্ত।

'প্রভু যিশু এলেন আজ' গানের স্বরলিপি

কথা, সুর ও স্বরলিপি : ড. বার্থলমিয় প্রতুষ সাহা

II	পা	পা	া	পা	পা	া	মা	জ্ঞা	া	রা	সা	া
	প্র	ভু	০	যি	শু	০	এ	লে	ন্	আ	জ্	০
	সা	রা	া	ণ্া	ণ্া	া	সা	া	া	া	া	া
	মো	দে	র্	এ	ধ	০	রা	০	০	০	০	য়্
	সা	র্সা	া	র্সা	র্সা	া	র্সা	া	র্রর্সা	ণা	ণা	া
	রা	খা	০	লে	রা	০	তাঁ	০	০র্	কা	ছে	০
	পা	মা	া	পা	দা	া	পা	া	া	া	া	া
	ম	হা	০	নন্	দে	০	যা	০	০	০	০	য়্
	পা	পা	া	পা	া	া	মা	া	জ্ঞা	রা	সা	া
	আ	কা	০	শে	০	র্	এ	ক	টি	তা	রা	০
	সা	রা	া	ণ্া	া	ণ্া	সা	া	া	া	া	া
	তা	দে	র	প	থে	দে	খা	০	০	০	০	য়
	সা	রা	া	জ্ঞা	মা	া	পা	দা	া	পা	মা	া
	হৃ	দ	য়্	আ	মা	র্	গো	য়া	ল্	ঘ	রে	র্

	পা	।	মা	জ্ঞা	রা	।	সা	।	।	।	।	।	II
	ও	০	ই	প	থে	০	ধা	০	০	০	০	য়্	
{	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্রা	র্সা	।	ণা	ণা	।	
	সে	থা	য়্	এ	খ	ন্	আ	ন	ন্	দে	তে	০	
	পা	।	মা	পা	দা	।	পা	।	।	।	।	।	
	স্ব	র্	গ	দূ	ত্	০	গা	০	০	০	০	য়্	
	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্রা	।	র্সা	ণা	ণা	।	
	প্র	ভু	০	যি	শু	র্	মু	খ্	টি	দে	খে	০	
	পা	মা	।	পা	।	দা	পা	।	।	।	।	।	}
	মা	নু	ষ্	শা	ন্	তি	পা	০	০	০	০	য়্	
	ণা	ণা	।	ণা	ণা	।	।	।	ণা	ণা	ণা	।	
	দ	লে	০	দ	লে	০	ভ	ক্	তে	রা	আ	জ্	
	র্সা	ণা	।	দা	দা	।	পা	।	।	।	।	।	
	তাঁর্	ই	০	কা	ছে	০	যা	০	০	০	০	য়্	
	পা	পা	।	দা	পা	।	পা	।	পা	দা	পা	।	
	প্র	ভু	র্	প্রে	মে	র্	স্প	র্	শে	স	বা	র্	
	মা	পা	মা	জ্ঞা	রা	।	সা	।	।	।	।	।	II
	জী	ব	ন	ন	তু	ন্	হ	০	০	০	০	য়্	
II	সা	রা	।	জ্ঞা	রা	।	সা	রা	।	জ্ঞা	রা	।	
	প্র	ভু	০	যি	শু	০	ব	লে	ন্	মো	দে	র	
	মা	মা	।	জ্ঞা	।	রা	সা	।	।	।	।	।	
	আ	মা	র্	শা	ন্	তি	না	০	০	ও	০	০	
	পা	পা	।	ণা	ণা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	
	স	ক	০	লে	রে	০	ভা	ল	০	বে	সে	০	
	র্সা	র্রা	।	র্সা	ণা	।	র্সা	।	।	।	।	।	
	জী	ব	ন্	কে	চা	০	লা	০	০	ও	০	০	
	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	র্সা	র্সা	।	
	দী	ন	০	দু	খী	০	আ	ছে	০	য	ত	০	
	র্ণা	র্সা	।	ণা	দা	।	পা	।	।	।	।	।	
	স	বা	ই	কে	বাঁ	০	চা	০	০	ও	০	০	
	পা	পা	।	দা	পা	।	পা	পা	।	দা	পা	।	
	অ	ট	ল্	থে	কে	০	প্র	তি	০	দি	ন্	০	
	মা	পা	মা	জ্ঞা	রা	।	সা	।	।	।	।	।	II
	ন্যা	য়্	প	রা	য়	ন্	র	০	০	ও	০	০	

শ্রদ্ধাঞ্জলি

'শীত মাঝে এলো বড়দিন
এলো বুঝি ঐ ফিরে।'

খ্রিস্টের জন্মোৎসব ২০২১ ও ইংরেজী নববর্ষ ২০২২ উপলক্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

৯ম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত সিমশন গোমেজ
জন্ম: ১০ মে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৮ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বালিডিওর, গোল্লা মিশন
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

মা-মনির স্বর্গে দেড় বছর

প্রয়াত প্রমিলা গোমেজ
জন্ম: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বালিডিওর, গোল্লা মিশন
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

'আমার মা ও বাবা অন্তরে আছে
যখন যেথা যাই, নিঃশ্বাসে মা
প্রশ্বাসে বাবা, কোনভাবে পাই।'

প্রাণপ্রিয় মা ও বাবা,

আজ মহান খ্রিস্টের এই জন্মোৎসব বড়দিনে, আমরা পরিবারের সকলে অন্তরের অন্তস্থল থেকে তোমাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। মাগো আজও মনে হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো। তোমরা কেমন আছো ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে, তোমাদের দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

যদিও আজ তোমরা আমাদের মাঝে নেই, তবুও তোমাদের আশীর্বাদ অকৃত্রিম ভালবাসা, স্নেহ ও মায়া-মমতা এবং মধুময় স্মৃতিগুলো আজও আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান। তোমরা রয়েছো আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে ও অন্তরের মণিকোঠায়। তোমাদের জীবনে আর কখনও ফিরে পাব না, তবে তোমরা বেঁচে থাকবে আমাদের হৃদয়ের নিঃসৃত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসায়।

তোমরা পরম পিতার সান্নিধ্যে থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর। যেন তোমাদের আদর্শ পথে চলার মধ্যদিয়ে আমরা সামনের দিনগুলো অতিক্রম করতে পারি। তোমরা স্বর্গরাজ্যে অনন্ত বিশ্রামে সুখে থেকো।

আসন্ন প্রভু যিশুর পুণ্য জন্মতিথিতে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাদের আত্মা অনন্তধামে চির শান্তিতে রাখুন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে –
তোমাদেরই আদরের সন্তানেরা
তেজগাঁও চার্চ, ঢাকা।

'আমি যিশুকে ভালবাসি এবং অনেক বেশী
যিশুকে ভালবাসতে চাই, আমি হতে চাই
সত্য পবিত্র সন্ন্যাসীনী ব্রত ধারিনী।'

প্রয়াত সিস্টার লরেন্স এমসি
(ভেরোনিকা পলিন রড্রিক)

জন্ম : ১৬ অক্টোবর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : দেওতলা (পাদ্রিকান্দা), গোল্লা মিশন।

চলে গেলেন আমাদের প্রিয় সিস্টার লরেন্স এমসি (ভেরোনিকা পলিন রড্রিক) যিশুর ডাকে সাড়া দিয়ে। তার জন্ম পাদ্রিকান্দা রড্রিক বাড়ির স্বর্গীয় লরেন্স ও মারীয়া রড্রিকের ৪র্থ কন্যার সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। তিনি পিতৃপ্রয়াণের পঞ্চদশ দিবস অতিক্রান্তের পর মাতৃগর্ব থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। পুত্রহারা পিতামহীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পৌত্রিকে ঈশ্বরের নামে ধর্মে ব্রতী হলে জীবন মহিমান্বিত হবে। এই বাসনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার আদরের পলিনকে। ধর্মপরায়না জননীর জীবন পলিনের জীবনে অসীম প্রভাব ফেলেছিল। শৈশবেই তার মধ্যে দুঃস্থ মানবতার প্রতি ভালবাসা, নিরন্ন উপবাসী-ক্ষুধার্ত মানুষ বাড়ীতে এলে তাদের অন্নদানে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে আনন্দ পেতেন।

তের বছর বয়সে নাগরীর পাঞ্জরা বোর্ডিং-এ গিয়েছিলেন এবং স্থানান্তরিত হয়েছিলেন তুমিলিয়া বোর্ডিং স্কুলে। পর্যায়ক্রমে পড়াশুনার মধ্য দিয়ে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন সেবাব্রত গ্রহণের নিমিত্তে।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় ফাদার পিটার দেশাই-এর অনুমোদনক্রমে সেবাকাজে বিশ্বনন্দিতা মাদার তেরেজার 'মিশনারিজ অব্ চ্যারেটি' ১৩ জানুয়ারি, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যোগ দিয়েছিলেন। তার ১ম ব্রত ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং শেষ ব্রত ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে সুসম্পন্ন করেন সিস্টার লরেন্স (পলিন) এমসি ছিলেন আত্মত্যাগী, চিন্তাশীল, কর্তব্যপরায়ন ও অসম্ভব প্রার্থনাশীল ব্যক্তিত্ব শারিরীক কষ্ট, ভগ্ন শরীর সত্ত্বেও দৃঢ় বিশ্বাস ও ইচ্ছায় নিজ কাজে নিষ্ঠাবান ছিলেন। নিজ জন্মভূমি বাংলাদেশ পেরিয়েও ভারতেও ছিল বিস্তৃত সেবাক্ষেত্রে দরিদ্র, পীড়িত, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে সেবায় সুস্থ করে তুলতেন। কোলকাতা, দিল্লী, উরিষ্যা বেনারস প্রত্যন্ত দরিদ্র কুটিরে পথে-প্রান্তরে, বস্তিতে-বস্তিতে পরম মমতায় সেবা দিয়েছেন। তার একটা বিশেষ গুণ ছিল কেউ কোন উপহার দিলে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। সেটা শিখেছিলেন সাধ্বী মাদার তেরেজা ও সিস্টার নির্মলা এমসি'র কাছ থেকে।

বয়োবৃদ্ধ স্বাস্থ্যবতির কারণে নানা অসুখ, দৃষ্টিশক্তি অসুবিধায় ভুগেছিলেন, একাধিক জটিলতা নিয়ে অবশেষে ১৩ নভেম্বর বিকাল ৩টায় সিস্টারগণ চ্যাপিলে প্রার্থনারত, তিনি নীরবে প্রার্থনায় যুক্ত হন। "তিনি যিশুকে ডাকেন, যিশু আমাদের দয়া কর, যিশু মারীয়া আমি প্রস্তুত তোমার দরজা খুলে দাও এবং কান্না করে বলেন, যিশু আমাকে জল দাও।' কর্তব্যরত সিস্টারগণ উনাকে জল দেন। সিস্টার লরেন্স এমসি তার আঙ্গুলে রোজারি মালা জড়িয়ে বুকের উপর হাত রাখেন, পরম শান্তিতে চলে গেলেন ঈশ্বরের বাড়িতে ১৪ নভেম্বর ভোর ৪টায়।

তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ৬জন পুরোহিত পোরোহিত্য করেন, এমসি সিস্টারগণ শিশুভবনের সকলে, ভাগিনা-ভাগিনী ও আত্মীয়স্বজন আপনাদের সাহায্য-সহযোগিতা দানে আমাদের অপূরণীয় ঋণে ঋণী করেছেন। আপনাদের সবাইকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
প্রয়াত পিতা-মাতা: লরেন্স-মারীয়া রড্রিক
প্রয়াত ৩ বড় দিদি-দাদাবাবু
ভাগিনা-ভাগিনীগণ
নাতি-নাতনী ও জামাইরা
পুতি-পুতিন এবং অসংখ্য আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

হৃদয়ে তোমরা অমর

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৪ মার্চ, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত শিশিলিয়া রোজারিও
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

প্রয়াত বেনজামিন রোজারিও
জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা
মৃত্যু : ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : বেওন, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত ইউফ্রেজী রেনু রোজারিও
জন্ম : ২৯ আগস্ট, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ আগস্ট, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : দরীর বাড়ি, মোলাশীকান্দা, ঢাকা

কালের আবর্তে দেখতে দেখতে ৭টি বছর পেড়িয়ে গেল তোমরা আমাদের ছেড়ে হারিয়ে গেলে সেই অনন্তের অসীম নীলিমায়। কিন্তু তোমাদের অনিন্দ সুন্দর সদাহাস্য মুখগুলো অফুরন্ত ভালবাসা, কতশত সুখময় স্মৃতি, তোমাদের জীবন আদর্শ আমাদের হৃদয়ে চির অম্লান থেকে তোমাদের শূন্যতা ও অভাবকে একটি পুরোপুরি সম্পূর্ণতা দিয়ে ভরে রেখেছে এবং অনুপ্রানিত করছে অকুতোভয়ে জীবন পথে চলতে এ অবর্ণনীয় এক সুখময় বেদনার অনুভূতি।

তোমরা তো আমাদের হৃদয়আকাশে তারা হয়ে নিত্য দীপ্তিমান। তোমাদের কি ভোলা যায়?

আমরা বিশ্বাস করি ও প্রার্থনা করি যে তোমরা ঈশ্বরের বাগানে সেরা ফুল হয়ে তার একান্ত সান্নিধ্যে পরম আনন্দে আছ। আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমাদের আদর্শে সর্বদা মিলে-মিশে আগামী দিনগুলো অতিবাহিত করে জীবন শেষে তোমাদের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমাদের আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
শান্তিভবন
বেওন, নিউ জার্সি, আমেরিকা।

প্রয়াত পিটার গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : কাজীর বাড়ি, বক্সনগর, ঢাকা
মৃত্যু : ৬ এপ্রিল, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান : জার্সি সিটি, নিউ জার্সি, ইউএসএ

প্রয়াত আইরিন গমেজ
জন্ম : ৭ জুলাই, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Until We Meet Again, Irene and Peter Gomes

Those special memories of you
will always bring a smile
If only we could have you back
for just a little while
Then we could sit and talk again
just like we used to do do
you always meant so very much
and always will do too
The fact that you're no longer here
will always cause us pain
but you're forever in our hearts
until we meet again

With love,
Veronica, Manuel, Elizabeth, Teresa
and Christopher

যখন আবার হবে দেখা

তোমাদের সেই বিশেষ স্মৃতিগুলো
সর্বদা নিয়ে আসবে আনন্দ বয়ে
যদি পেতাম তোমাদেরকে কাছে
শুধু ক্ষণিকের তরে
তখন বসে আবারও গল্পগুজব করতাম
যেমন করতাম ঠিক আগের মত।
তোমরা যে সর্বদা ছিলে আমাদের কাছে
অনেক প্রিয় এবং থাকবেও তাই
প্রকৃতপক্ষে তোমরা যে আমাদের কাছে আর নেই
এটা ভেবে আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়
কিন্তু তোমরা তো আছ সর্বদা আমাদের সাথে
যে পর্যন্ত না আবার দেখা হবে।
তোমাদেরই সন্তানেরা
ভেরোনিক (শোভা), ম্যানুয়েল (বাবুল), এলিজাবেথ (সন্ধ্যা)
তেরেজা (জ্যোৎস্না) ও খ্রীষ্টফার (টিলু)

স্মৃতিতে তুমি অমর

আন্তনী জীবন গমেজ
জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিগত ১৬ জানুয়ারি রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, আন্তনী জীবন গমেজ, এক স্নেহাশীষ পিতা, দাদু এবং এক প্রিয় মামা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।
আন্তনী গমেজের জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। তিনি ছিলেন লাজারেস ও লুসি গমেজের পাঁচ সন্তানদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি এলিজাবেথ লিওনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৫ জানুয়ারি, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। ঈশ্বর তাদেরকে দুইজন মেয়ে - জেইন লুসি এবং জুন আইরিন এবং একজন ছেলে - কেনেথ লাজারেস দিয়ে আশীর্বাদ করেন।
আন্তনী সৌদি আরবে কয়েক বছর কাজ করেন। পরে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর অভিবাসন নিয়ে সপরিবারে আমেরিকায় চলে আসেন এবং অঙ্গরাজ্য নিউ জার্সির, জার্সি সিটিতে আজীবন বসবাস করেন। তিনি আরামাক কোম্পানীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত কাজ করেন।
বড়দিনের সময় তিনি তার বিশিষ্ট কেক বানাতে এবং সেগুলো পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে বিলাতে খুব ভালবাসতেন। বাংলাদেশের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের দেখতে যেতে খুব পছন্দ করতেন এবং তাতে প্রচুর আনন্দ পেতেন।
আন্তনী ছিলেন একজন কর্মঠ, স্নেহশীল, সৎ, সাধারণ ও স্বল্পভাষী মানুষ কিন্তু স্বপ্ন ও প্রেমে ভরপুর। তিনি ছিলেন একজন স্নেহশীল পিতা ও আদর্শ স্বামী। তিনি এমন একটি শূন্যতা সৃষ্টি করে গেছেন যা কোনদিন পূরণীয় নয়।
আন্তনী গমেজ রেখে গেছেন তার স্ত্রী, তিন সন্তান, জামাতা, নাতি, ভাগ্নে-ভাগ্নি। আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব।
সর্বশক্তিমান ঈশ্ব যেন তাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : এলিজাবেথ গমেজ, মেয়ে : জেইন লুসি গমেজ, মেয়ে ও জামাতা : জুন আইরিন ও মহম্মদ আহমেদ, ছেলে : কেনেথ লাজারাস, নাতি : মার্চ

In Loving Memory of Anthony Jibon Gomes

Anthony Jibon Gomes, a loving father, grandfather and a beloved uncle, passed away on Saturday, January 16, 2021, at the age of 69.
Anthony was born on March 28, 1951, in the district of Pabna, Bangladesh. He was the fourth of late Lazarus and Lucy Gomes' five children.
He married Elizabeth Leona on January 5, 1979. They raised two daughters- Jane Lucy and June Irene and a son - Kenneth Lazarus.
He worked in Saudi Arabia for several years. He then immigrated to the United States of America on October 8, 1988 and settled in Jersey City, New Jersey. He worked at Aramark till his retirement.
Anthony loved baking his signature cakes during Christmas and share them with the family, relatives and friends. He enjoyed visiting family and friends in Bangladesh and it filled him with great joy.
Anthony was very hardworking, loving, honest, simple and a man of few words but filled with dreams and love. He was a loving father and an ideal husband. He cared for the less fortunate and often donated. He has left a void that can never be filled.
Anthony is survived by his wife, three children, son-in-law, grandson, in-laws, nieces and nephews, his sister and hosts of friends.
May God grant Anthony eternal peace and happiness.

With live,
Elizabeth, Jane, June, Kenneth, Ahmed and Mars

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর বিশ্বাস করে,
সে মরলেও জীবিত হবে"। (যোহন ১১: ২৫)

বাবা: সিরিল ডি রোজারিও
জন্ম : ৩ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ধনুন, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

মা: মারিয়া রোজারিও
জন্ম : ৭ আগস্ট, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : তিরিয়া, নাগরী মিশন
মৃত্যু : ১ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
নিউইয়র্ক, আমেরিকা

আমাদের **'মা' মারিয়া রোজারিও-চম্পাবতী** গত ১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে নিউইয়র্ক শহরের নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি হসপিটালে সংসারের মায়া ছেড়ে ঈশ্বরের কাছে চলে গেছেন; পরমপূজনীয়া, স্নেহশীলা মা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করে গেছেন- মা বাংলাদেশ, ঢাকা **সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম** এবং নিউইয়র্ক মানহাট্টন **সেনাসংঘের সেক্রেটারী** হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমাদের **বাবা সিরিল ডি রোজারিও** গত বছর করোনাকালীন সময়ে ১০ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ গুডফ্রাইডেতে আমাদের ছেড়ে স্বর্গে পাড়ি দিয়েছেন। বাবা তার জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি বিভিন্নভাবে সমাজকর্মে বিশেষ করে নাগরী ও ঢাকা ক্রেডিট কমিটির চেয়ারম্যান এবং ঢাকা **সেনাসংঘের কমিশিয়ামের প্রেসিডেন্ট** হিসাবে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আমাদের বাবা-মা তাদের বিবাহিত জীবনের প্রায় ৬৯টি বছর একসাথে অতিবাহিত করেছেন। তারা দু'জনে মিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে **সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম** গঠন করেছেন, এমনকি আমেরিকার ৪টি স্টেটেও সেনাসংঘের প্রেসিডিয়াম গঠন করেছেন। আমার মায়ের শেষ ইচ্ছা সেনাসংঘের কার্যক্রম যেন অব্যাহত থাকে ।

গত, ৪ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মাকে নিউজার্সি সিটির **"হোলিনেম"** কবরস্থানে বাবার কবরেই সমাধিস্থ করা হয়েছে, প্রার্থনা করি পরমকরুণাময় ঈশ্বর এবং মা মারীয়ার কৃপায় মা-বাবা যেন অনন্ত জীবন লাভ করেন।

শোকাহত সন্তানগণ,

সমর, স্বপন, সুবাস, সুধীর এবং চিত্রা

চলে গেলেন আন্না দেশাই না ফেরার দেশে

প্রয়াত আন্না দেশাই
স্বামী: প্রয়াত যোয়াকিম দেশাই
মৃত্যু: ১৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অন্ধকারে যিনি জ্ঞানের দ্বীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন তিনি শিক্ষক, তিনি মহান, তিনি জ্ঞানী, তিনি গুণী। শিক্ষকতার এই মহান পেশায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন দেশ ও জাতির সেবায় হয়ে উঠেছিলেন মানুষ গড়ার এক শ্রেষ্ঠ কারিগর, তাই অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন।

বিগত ১৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মিসেস দেশাই, স্বামী প্রয়াত যোয়াকিম দেশাই নিউইয়র্কের এলর্মহাস্ট হসপিটালে (Elmhurst Hospital) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় আক্রান্ত ছিলেন।

পেশাগত জীবনের শুরুতেই তিনি চট্টগ্রামের জামাল খাঁ স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। তিনি ঢাকার হলিক্রস স্কুলে একটানা ১৭ বছর শিক্ষকতা করেন ও অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও অমায়িক। অতি সহজেই এমনকি মুহূর্তেই তিনি মানুষের সাথে মিশে গিয়েছেন। নানা সামাজিক কাজ-কর্মে তিনি সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিলেন দেশে-বিদেশে। নিউইয়র্কের প্রবাসী সমাজের প্রতিটি মানুষের সাথে তার ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। দিনের অধিকাংশ সময়েই তিনি ছিলেন সকলের সাথে ফোনে ফোনে নানা কথাবার্তায় ব্যস্ত।

উল্লেখ্য, তিনি কাকরাইল ধর্মপল্লীর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর ঢাকা ছেড়ে নিউইয়র্ক আগমন করেন এবং সুদীর্ঘ ৩০ বছর এখানে বসবাস করেন। জন্মসূত্রে তিনি ঢাকার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর ধীন ভূঁয়া বাড়ির কানাই কস্তার মেয়ে ছিলেন।

মৃত্যুকালে রেখে গেছেন দুই মেয়ে শিলা, লীলা ও লীলার স্বামী-সুবীর রোজারিও। তাদের ঘরে এক নাতনী দোলা, তিন নাতী অভি, সুমিত ও টনি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

বড় মেয়ে:	শিলা গমেজ
বড় মেয়ে ও জামাই:	দোলা ও রেমজে
ছেলে ও বউ:	সুমিত ও স্টেফানী গমেজ
ছোট মেয়ে ও স্বামী:	লীলা ও সুবীর রোজারিও
তাদের বড় ছেলে ও বউ:	অভি ও রাখী রোজারিও
ছোট ছেলে:	টনী রোজারিও
পুতিন:	আরবিন, আমিল, আরিয়া, ইডেন, আগষ্টিন ও নোয়া।

স্ক্রিপ্ট লেখক:- সুবীর রোজারিও

বাবা / দাদু
আমরা তোমায়
অনেক অনেক ভালবাসি

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া
মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
(ইউনাইটেড হাসপাতাল, ঢাকা)
গ্রাম : কুচিলাবাড়ি
মঠবাড়ি মিশন, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

দেখতে দেখতে বছর চলে গেল, ফিরে এলো বড়দিন। এতো তাড়াতাড়ি তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে, তা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তেমন কোন অসুস্থতার লক্ষণও তোমার মধ্যে আগে থেকে পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরেও কঠিন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে- সব মিলিয়ে প্রায় এক মাসের মধ্যেই একজন জলজ্যান্ত মানুষ থেকে শুধুই ছবি হয়ে গেলে সবার কাছে। অনন্তের অসীম নীলিমায় হারিয়ে গেলে তুমি। তোমাকে ছাড়া আমাদের কোন কিছুই আর পরিপূর্ণতা পায় না। কোন পার্বণ বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান, কোন কিছুতেই না। একটা অপূরণীয় শূন্যতায় নিমগ্ন থাকে সবাই। খেতে গেলে ও সন্ধ্যা প্রার্থনার সময় তোমার চেয়ারখানা আজও খালি পড়ে থাকে। রাতে ঘরে ফিরতে দেরী হলে – আর তোমার কল বেজে ওঠে না। কেউ আর আদরমাখা গলায় বলে না "দেরী করতেছো কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খেয়ে বিশ্রাম করো।" এখন সেইসব কিছুই একটা ছবিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। হাসপাতালে থাকা অবস্থায় শত কষ্টের মধ্যেও কোনদিন বলো নাই- কষ্টের কথা। "কেমন আছো" জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে "আমি তো ভালই আছি।" শৈশবে মাকে হারিয়ে তুমি বেড়ে উঠেছিলে সীমাহীন অনাদরে – মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে। জীবনযুদ্ধে তুমি কখনও পিছু পা হওনি - ছোটবেলা হতে অধ্যবসায়ের দ্বারা কিভাবে বড় হওয়া যায় ও জীবনে উন্নতি করা যায় - তা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ। অলসতা তুমি মোটেও পছন্দ করতে না। তুমি ছিলে কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তী। সময়ের কাজ সময়ে ও নিজের কাজ নিজে করতে তুমি উৎসাহিত করতে সবাইকে। মা মারীয়ার প্রতি তোমার অসীম ভক্তি ছিলো। রোজই রোজারীমালা হাতে করে হাঁটতে বেরোতে এবং সন্ধ্যায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিয়মিত রোজারীমালা প্রার্থনা করতে – নিয়মিত গির্জায় যেতে খ্রিস্টযাগ শুনতে।

তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ করো আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি এবং ঈশ্বরের পথ থেকে যেন বিচ্যুত না হই।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বাবা / দাদু- কে স্বর্গে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তোমার সহধর্মিনী
সিসিলিয়া রোজারিও

তোমার স্নেহধন্য –
পুত্র ও পুত্রবধূগণ এবং একমাত্র কন্যা ও জামাতা

তোমার অনেক আদরের নাতি–নাতনিরা –
ঐশী, যাকোব, অর্থী, অন্তী, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা, অথৈ, অবনী, রাহেল, মার্সিয়া ও স্যাম।

সবার প্রতি রইলো বড়দিন
ও
নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

প্রয়াত এনেষ্টিনা রোজারিও

জন্ম: ২ মার্চ, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ।

"ধন্য মা, ধন্য তুমি,
দিয়েছ জন্ম,
দেখেছি ভূবন"

বছর ঘুরে আবারো এলো আমাদের প্রিয় প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি। সেই সাথে মনে উঠল তোমার জগৎ প্রস্থান করার কথা। তুমি পেলে পরম প্রভু হতে one way ticket. যার কোন কিছুরই মাসুল বা বুকিং দিতে হয় না ।

আজকের এই বিশেষ দিনে বিদেশে বসবাসরত হয়েও মনে পরে তোমার কথা। আশীর্বাদ করবে মৃতলোকের রাজ্য হতে। সেই সাথে শুলপুরবাসীসহ দেশ-বিদেশের সকলকে জানাই শুভ বড়দিন ও নতুন বছর ২০২২ আগমনের এক গুচ্ছ হিমেল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

প্রার্থনা করি প্রভু যিশু আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুক, যেন আমাদের সকলের জীবন আরও সুন্দর, সুস্থ-সবল এবং আনন্দময় হয়।

মিন্টু ও পারভিন
জয় এবং জয়ী রোজারিও
Sydney-Australia

প্রয়াত রন্‌জিৎ রিচার্ড গমেজ

জন্ম: ১৮ জানুয়ারি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

চলে যাওয়া মানেই প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়

দেখতে দেখতে কেটে গেলো এক বছর। আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি পরম পিতার কোলে আশ্রয় নিয়েছো। তুমি আমাদের মাঝে স্বশরীরে উপস্থিত নেই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আমরা যেখানেই থাকি, তুমি আমাদের সঙ্গেই আছো আর আমাদের পথ প্রদর্শন করছো। তুমি ছিলে, আছো আর চিরকাল বেঁচে থাকবে আমাদের অন্তরের গভীরে। আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনায় তুমি রয়েছ এবং থাকবে অনন্তকাল। তুমি ছিলে এক জন নম্র, দয়ালু, সাদাসিধে, সৎ ও প্রার্থনাশীল মানুষ। স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো, যেন আমরা তোমার আদর্শে চলতে পারি আর একদিন যেন তোমার সাথে স্বর্গধামে মিলিত হতে পারি।

তোমারই রেখে যাওয়া পরিবার,

স্ত্রী : রোজ মেরী গমেজ
বড় মেয়ে ও জামাতা : সোনিয়া ও সানি
ছোট মেয়ে : সুপ্রিয়া গমেজ

প্রবন্ধ

ধৈর্যের চাবি সুখের দরজা খুলে দেয়

ব্রাদার রঞ্জন লুক পিউরিফিকেশন সিএসসি

ভূমিকা : মানুষের জীবনে ধৈর্য একটি মহৎ গুণ এবং ব্যক্তি জীবনের ভূষণ। ধৈর্য মনুষ্যত্বের অন্যতম পরিচায়ক। যারা এই গুলোর অধিকারী তারা কোন না কোন ভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেই। ধৈর্যকে বলা হয় গুণের রাণী। অর্থাৎ আমাদের জীবনে যত গুণের সমাহার ঘটেছে তন্মধ্যে ধৈর্য অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ। জীবনে সফল হওয়ার জন্য ধৈর্যধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ধৈর্য সফলতার চাবিকাঠি। জীবনের সর্বাবস্থায় আমাদের ধৈর্যধারন করা উচিত, অধৈর্য্য হয়ে ভেঙ্গে পড়লে কোন কাজে সফল হওয়া যায় না। অনেকেই কোনো কাজে তাৎক্ষণিক সফল না হলে হতাশ হয়ে পড়েন। যারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যে সকল মণীষীদের আগমনে পৃথিবী ধন্য হয়েছে তারা সবাই ধৈর্যশীল ছিলেন। স্বয়ং বিধাতাও ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। কাজেই চেষ্টা ও ধৈর্যর কোন বিকল্প নেই। সফলতার জন্য চেষ্টা আর ধৈর্যই মূল চাবিকাঠি।

ধৈর্য হচ্ছে মানুষের জীবনে এমন একটি গুণ যার কারনে ব্যক্তি অসুন্দর ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। এটি মানুষের একটি অন্তঃস্থিত শক্তি যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারে। ইসলামিক চিন্তাবিদ "মোল্লা আহমাদ নারাকি" তার বিখ্যাত গ্রন্থ "মিরাজুস সায়াদাত" এ বলেছেন " ধৈর্য হলো ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা"।

এই মহৎ গুণটি অর্জন করা যদিও কঠিন কাজ, কিন্তু অসাধ্য নয়। বলা যায় সফলতার মূল চাবিগুলোর একটি হলো ধৈর্য। মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে রয়েছে সফলতা-ব্যর্থতা। যদিও সবাই চায় কাজের সফলতা। কিন্তু কাজের সফলতা ভোগ করতে হলে মানুষকে ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল হতে হবে। তাড়াহুড়া করে কোনো কাজ করা হলে তা সাধারণত চূড়ান্ত সফলতা নিয়ে আসে না। তা ছাড়া তাড়াহুড়া করা সঠিক মানুষের কাজ নয়। তাই মানুষের উচিত সর্বকাজে সুচিন্তা ও ধৈর্য অবলম্বন করা। বিশেষ ভাবে ধৈর্যকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে হয়। কেউ কষ্ট দিলে কিংবা আঘাত করলেও ধৈর্য ধারণ করা মানুষের দায়িত্ব। ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যেদিয়ে আমরা জানতে পারি যে, মহান সৃষ্টিকর্তা ধৈর্যশীলদের সাথে সর্বদা অবস্থান করেন। তাদের তিনি সাহায্য করবেনই করবেন।

ধৈর্যশীল ও সহনশীল হওয়া : কাজকর্মে কিংবা ব্যক্তি জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সহনশীল বা ধৈর্যশীল হওয়া দরকার। ধৈর্য্যের ফল মিষ্টি। অধৈর্যশীল ব্যক্তি জীবনে সুখী হতে পারে না। যারা ধৈর্য ধারণ করতে অক্ষম তারা প্রকৃতপক্ষে ভীরু ও কাপুরুষ। তাদের ব্যক্তিত্ব ধৈর্য ধারণের ক্ষেত্রে দুর্বল। মানবজাতিকে জীবনের সর্বস্তরে উন্নতি সাধন করতে হলে অবশ্যই ধৈর্য নামক গুণটি নিজ জীবনে আয়ত্ব করতে হবে। কারণ মানুষের গুণাবলির মধ্যে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা অন্যতম গুণ। বিপদ-আপদে অধৈর্য্য হলে বিপদ কাটে না, বরং ক্ষুদ্র বিপদটি সমূহ বিপদে পরিণত হয়। তাই সর্বকাজের সফলতার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করা মানব জাতির জন্য খুবই প্রয়োজন। ধৈর্য্যের আড়ালেই মানুষের অসীম সুখ ও শান্তি নিহিত। পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তাও ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

তাড়াহুড়া না করা : অনেকেই আছে যারা কাজে ধীরস্থিরতাকে পছন্দ করে না। তাড়াহুড়াকে কাজের মূল চালিকাশক্তি মনে করে। তারা একবার একটু অনুধাবন করলে দেখতে পারবে যে, ধীরতা-স্থিরতা মানুষের জীবনে অনেক মঙ্গল বয়ে আনে যেখানে অনেকের কল্যাণ নিহিত থাকে এবং স্রষ্টার অনুগ্রহও বিদ্যমান থাকে। চিন্তাশীলতা ও ধৈর্যশীলতা নিয়ে কাজ করলে এই কাজের সুফল অনিবার্য এবং কাজের ফল দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং প্রতিটি মানুষের উচিত জীবনে ধৈর্যশীল হওয়া এবং সেইভাবে কাজ করা।

চিন্তাভাবনা করা : সুখের দরজা খুলে দেওয়া বা কাজের সফলতার আরো একটি সোপান হলো চিন্তাশীল হওয়া। ভাবনাহীন কাজ প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কর্মের সুফল পেতে হলে অবশ্যই ব্যক্তিকে কাজ নিয়ে ভাবতে হবে এবং ভালো-মন্দ উভয় দিক বিবেচনা করতে হবে। কারণ পরিকল্পনাহীন কাজ মানব জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। এমনকি এতে নিজের সম্পদ, পরিশ্রম ও সময়ের সিংহভাগই অপচয় হয়। তাই প্রতিটি কাজের সফলতার পূর্বশর্ত হচ্ছে পূর্বপরিকল্পনা। আগে চিন্তাভাবনা করতে হবে, অতঃপর কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। চিন্তার ফল যদি উত্তম বলে বিবেচিত হয় তবেই তা সম্পাদন করা উচিত, পক্ষান্তরে যদি মন্দের আশংকা থাকে তখন তা থেকে বিরত থাকাই ভালো।

আমরা ধৈর্য ধারণ করবো কেন : ধৈর্যশীলতা চর্চা করা আমাদের প্রতিটি মানুষের প্রয়োজন। এর দ্বারা ব্যক্তি নিজে বহুভাবে উপকৃত হতে পারবে এমন কি তার পরিবার-পরিজন, সমাজ উপকৃত হতে পরবে। ধৈর্যধারণের সুফল আমাদের প্রতিটি পদে পদে প্রয়োজন হয়। প্রতিদিনের জীবনে ধৈর্যের শিক্ষা বড় বেশী জরুরী হয়ে ওঠে। সন্তানদের ধৈর্যশীল করে বড় করতে হয়। কর্মজীবনেও এর প্রয়োগ অনেক গুরুত্ব বহন করে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ধৈর্য্যের পরিপূর্ণ চর্চা করলে চার ধরনের সুফল মানুষ পেতে পারবে।

ক) স্বাস্থ্যকর মানসিক অবস্থা : মনোবিজ্ঞানী রবার্ট এমোসন এর মতে, ধৈর্যশীল মানুষেরা অপেক্ষাকৃত কম বিষন্নতায় ভোগেন। তাদের মাঝে নেতিবাচক আবেগ কম কাজ করে। তারা চাপপূর্ণ যে কোন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে বা সামাল দিতে পারেন।

খ) ভালো বন্ধু ও প্রতিবেশি : মনোবিজ্ঞানী ডেবরা আর কোমার ও লেসলি ই সিকারকার মতে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা অন্যের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে ভালো বন্ধু ও প্রতিবেশী হয়ে থাকেন। গবেষনায় দেখা গেছে, ধৈর্যশীলদের মনে অনেক বেশী সহমর্মিতা, সহনশীলতা, দয়া, ক্ষমাশীলতা ও সহযোগিতাপরায়ণ মনোভাব বিরাজ করে। সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল মানুষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই মানুষ গুলো আদর্শ প্রতিবেশী, সহযোগী এবং ভালো বন্ধু হতে পারে।

গ) লক্ষ্য পূরণে : যে কোন লক্ষ্য সাধনের পথটা অনেক দীর্ঘ ও বন্ধুর বলেই মনে হয়। যারা তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখতে চান, তারা সহজে লক্ষ্য অর্জনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন না সফলতা লাভে বা লক্ষ্য পূরণের জন্য ধৈর্যধারণ অনেক গুরুত্ব বহন করে।

ঘ) সু-স্বাস্থ্যের জন্য : গবেষণায় বলা হয় যে, ধৈর্য সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অংশ বলে গণ্য হতে পারে। ধৈর্যশীল ব্যক্তিরা সামান্য রোগে-শোকে দিশেহারা হয়ে পরেন না। বা এতো বেশী চিন্তিতও হয়ে পরেন না। নিজের মধ্যে একটা মানসিক শক্তি কাজ করে আর দ্রুত সেরেও উঠেন। কিন্তু যাদের ধৈর্য কম তাদের মধ্যে রোগের বিষয়ে অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা

(৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রবন্ধ

রাষ্ট্র বিনির্মাণে যুবারা

লিটন ইসাহাক আরিন্দা

ভূমিকা: বাংলাদেশে তরুণদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বর্তমানে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর (১৫-২৫) ২১% এবং (১৫-৩৫ বছর) ৩৩% যুব সমাজ। যুব শক্তি যে কোনো দেশের উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুব সমাজ মহান কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে যাচ্ছে। পূর্বে দেশের প্রতিটি অর্জনেই তাদের ভূমিকা, ত্যাগ ও অংশগ্রহণ ছিল অপরিসীম। সমাজ রাষ্ট্র ও মণ্ডলী গড়ার কাজে তাদের অংশগ্রহণ ও অবদান অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। তবে বর্তমানে নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ব্যাহত হচ্ছে। যুব শক্তিকে সঠিকভাবে গঠন দিয়ে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে রাষ্ট্র ও মণ্ডলী দক্ষ এবং সৃজনশীল নেতৃত্ব পায়।

বিগত দিনের যুব সমাজের কার্যক্রম: যুবারা একটি সমাজ দেশ ও মণ্ডলীর চালিকা শক্তি। আমরা বাঙালি জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই। যুবারা ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সমাজ সংস্করণের কাজে একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। পরিবার, সমাজ ও দেশের পাশাপাশি মাণ্ডলীক জীবনেও যুবারা অনেক ইতিবাচক অবদান রেখেছে। যুবাদের এইসব ত্যাগ ও অবদান জাতি এবং মণ্ডলী কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করে। আগেরকার দিনের যুবাদের ত্যাগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও দায়িত্ববোধ চোখে পরার মত ছিল, তাদের সংগ্রামী জীবন অন্যদের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

বর্তমান যুব সমাজের হালচাল ও অবস্থা: বর্তমানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী যুব সমাজের আওতাধীন। বর্তমানে যুবসমাজের কিছু অবক্ষয়ের কারণগুলো নিয়ে আমাদের ভাবা ও কাজ করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। যুবাদের একটি অংশ মাদকের সাথে জড়িয়ে পরছে, ফলে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট তো হচ্ছেই সাথে সাথে পিতা-মাতা, সমাজ, জাতি ও মণ্ডলীও আশাহত হচ্ছে। যুবারা খুন, ধর্ষণ, চুরি ডাকাতির পথ বেছে নিয়েছে এবং অনৈতিক কাজের জন্য দল, বা কিশোর গ্যাং তৈরি করছে। এর সাথে মোবাইল ও ইন্টারনেট আসক্তি, কম্পিউটার গেইম, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মনোভাব, নিজ অবস্থা ও সামর্থ্য না বুঝে অতিরিক্ত অনুকরণ। এগুলো যুব সমাজের মধ্যে হতাশা ও মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করছে। বেকার সমস্যাও যুবাদের নৈতিক পতন ঘটাচ্ছে।

যুবাদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ শুধুমাত্র যুবারাই নয়। এর জন্য পরিবার সমাজ, রাষ্ট্র ও মণ্ডলীও দায়বদ্ধ। বর্তমানে পরিবারগুলোর দিকে তাকালে দেখব, সবার একটা প্রতিযোগিতা আমার সন্তানই সবকিছুতে প্রথম হবে, আর একলা চল নীতিতে চলা, এগুলো সন্তানদের যেমন স্বার্থপর করছে অন্যদিকে অহেতুক প্রতিযোগিতার পিছনে ছুটাচ্ছে। তাই অতিরিক্ত সুখ ভোগ ও উল্লাস। ত্যাগ নয়, ভোগ। বর্তমান প্রজন্মের যুবারা এই অবস্থার শিকার। কর্মমূখী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব, সমাজ ও রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উদাসীনতা। এই সবের কারণে, যুবারা নিজের প্রতিই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। তারা হতাশ ও নিরাশ হচ্ছে ফলে, তারা মাদকাসক্ত হচ্ছে। এমনকি তারা আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছে।

যুবাদের গঠন ও করণীয়: আজকের যুবারাই আমাদের বর্তমান ও আগামী দিনের পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর পরিচালক। তাই যুবাদের বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ পৃথিবী দেখা অসম্ভব। তাই যুবাদের গঠনের জন্য কার্যকারী পদক্ষেপ নিতে হয়: প্রথমেই যুবাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ মনোভাব ও সৃজনশীল হতে হবে। মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রতিযোগিতা করা। নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস ও অন্যকে বিশ্বাস করে একলা চলার মনোভাবের পরিবর্তন করা। দায়িত্ববোধ ও ত্যাগস্বীকারের মনোভাব। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও শিক্ষার মনোভাব। নিজ কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি যত্নশীলতা ও সৃষ্টির যত্নে উদ্যোগী হওয়া। সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

রাষ্ট্র ও মণ্ডলী পরিচালনাকারী ব্যক্তিবর্গ যুব শক্তিকে কর্মপরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেন। তারা বিশ্বাস করেন দেশ ও মণ্ডলীর উন্নয়ন ঘটবে তখনই যখন যুবকদের সঠিক যত্ন নেয়া হবে। আর এর ফলশ্রুতিতে উভয়ই অনেক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যুব দিবস পালন ও যুব মেলার আয়োজন, কর্মমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালু হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। মণ্ডলীও যুবাদের বিভিন্ন পর্যায়ে যুব দিবস পালন, ধর্মপল্লীর কাউন্সিল, কমিটি ও উপকমিটির সদস্য করা হচ্ছে। আর পোপ মহোদয়ের যুবাদের নিয়ে করা ২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১৮ সিনডতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। যুব সমাজের অবক্ষয় থেকে বের করে আনতে ও তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

১) যুব সমাজকে সুসংগঠিত করে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনতে যুবাদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হলে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ে পার্থক্য বুঝতে পারবে। ফলে যুবারা অমানবিক ও অসহিষ্ণু আচরণ করবে না।

২) আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। রাষ্ট্র ও মণ্ডলীকে যুবাদের ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উৎসাহ দান ও তাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক যত্নের ব্যাবস্থা করা।

৩) কর্মসংস্থান ও সমাজকল্যানমূলক কাজের ব্যবস্থা করা। বেকারত্বের কারণে যুব নৈতিকতার অবক্ষয় একটা বড় অংশই দায়ী, তাই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রসার ঘটিয়ে যুবদের অংশগ্রহণে উদ্যোগী করা।

৪) সুস্থ বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যাবস্থা। শরীরের চাহিদা পূরণে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি মনের জন্যে প্রয়োজন বিনোদন। অন্যদিকে নিজ কৃষ্টি সংস্কৃতি চর্চা ও তার রক্ষার জন্যে যুবাদের উৎসাহ দান করে উদ্যোগী করে তোলা।

৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। যুবাদের গঠনে ও দক্ষ করে তুলতে চাই একটা সুস্থ পরিবেশ। আর এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও মণ্ডলী গঠনে দরকার গতি, শক্তি ও প্রগতিশীলতা। সংগ্রাম, সংস্কার ও সংরক্ষণে যুবারাই অগ্রনায়ক। আবার এই বয়সেই বিপথগামীও হয় তারা। আমাদের যুব সমাজকে মেধা মননে যোগ্য করে তুলতে চাই প্রকৃত যত্ন ও গঠন। এতে করে শক্তিশালী ও টেকসই উন্নয়নে ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও মণ্ডলী গঠনে যুবারা সঠিক পথে এগিয়ে যাবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষকে সজাগ থাকতে হয়।

উপসংহার: যুব শক্তি রাষ্ট্র বিনির্মাণে ও মণ্ডলীর গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। যুব সমাজ গঠনে পরিকল্পিত কাঠামো ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন ও সময়ের দাবী। একটি দক্ষ সৃষ্টিশীল যুবশক্তি একটি সুস্থ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র মণ্ডলী উপহার দিবে। আসুন তাদের এই পথ চলায় সবাই সামিল হয়ে সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ি॥

সাদা-কালো জীবন- ৫

মালা রিবেরু (পামার)

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের আচরণ নিয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে গেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন আমেরিকান বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী বিএফ স্কীনার (Burrhus Frederic Skinner)। তার গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুসারে মানুষ পরিচালিত হয় উৎসাহ অথবা (Reinforcement) সমর্থনের মাধ্যমে, তা হতে পারে ইতিবাচক (Positive) অথবা নেতিবাচক (Negative) সমর্থন বা উৎসাহ।

বাস্তবেও এর অনেক প্রমাণ পেয়েছি যে মানুষের জীবনে চলার পথে অনেক ভুল অন্যায় করে বা অনেক সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করে, মনোবিজ্ঞানী আগুইলের (Aguilera) সূত্র অনুসারে মানুষ সেইসময় যদি তিন রকমের সমর্থন বা উৎসাহ পায় তাহলে সেই সংকট বা দুর্যোগ অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হবে- ১.বাস্তবতার আলোকে ঘাটনা বুঝা, ২.পর্যাপ্ত পরিমাণ সর্মথন ও ৩.প্রতিরোধ ক্ষমতা। সুতরাং তিনটি উপাদান একত্রে আথবা ভিন্নভাবে এক একটি আমাদের পরিচালিত করে সামনের দিকে পরিচালিত হতে। যদি সম্মিলিত অথবা এক একটি উপাদান নৈতিবাচক ভাবে পরিচালিত হয়, তাহলে পরিচালিত হয় অসামাজিকভাবে, মদ, সিগারেট, ড্রাগে আসক্ত হয়, সবশেষে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায়।

এর বাস্তব প্রমাণ আমাদের কাছে অনেক আছে, আমি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সদ্য, সে প্রতিষ্ঠানে তিন শিক্ষক যোগদান করেছেন, তারা চাকুরিক্ষেত্রে আমার থেকে সিনিয়র কিন্তু শিক্ষক হিসাবে নবীন। হাসপাতাল থেকে ইনস্টিটিউটে যোগদান করে নতুন কর্মক্ষেত্রে, আনন্দ একটু বেশী, তাই তার অনুভূতি সবার সাথে সহভাগিতা করছেন। আমার রুমমেট হওয়ার কারণে একজন হাসিখুশি মনের মানুষ হঠাৎ মন খারাপ কারণ জানতে চাইলে বললো, আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমার বান্ধবীর সাথে কথা বলে। আমি আমার বান্ধবীকে আমার শিক্ষক হওয়ার খবরটা দেওয়ার খুশি বা উৎসাহ দেওয়ায় পরির্বতনে, আমি কেন ঢাকার আরাম ছেড়ে দূর গিয়েছি তা ভুল করেছি বলছে, যা আমার শুনে মনটা অনেক খারাপ হয় গেছে। শিক্ষক পেশায় আসাটা কি আসলেই ভুল হয়েছে। আমি বললাম অবশ্যই ভুল হয়নি, আপনি নিজে যেই জায়গায় কাজ করে আনন্দ পাবেন সেইটা আপনার সন্তুষ্টি, হাসপাতালে রোগিদের সেবা দেওয়া একধরনের আনন্দ অনুভূতি, আবার যারা দক্ষ নার্স বা মিডওয়াই হয়ে রোগিদের সেবা প্রদান করবে, তাদের তৈরি করা অন্যরকম আনন্দ। উনি এই পেশায় আসেনি, তাই আপনার চিন্তাধারার সাথে এক হতে পারেনি। তাই এই নৈতিবাচক কথা বা নিরৎসাহিত কথা বাদ দিয়ে আপনার বাস্তবিক ভাবনা দিয়ে সামনে এগিয়ে যান।

এর বাস্তবিক উদাহরণ আমরা আরো দেখতে পাই যে, স্কুল থেকে বেত মারা, গালি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ বেত ও গালির কারণে ভয়ে অনেক ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে উংসাহবোধ করেনা।

যেই শিক্ষক রাগ করে বা গালাগালি করে ভয়ে ক্লাশ করে, কিন্তু মনের কথা বা প্রশ্ন করতে ভয় পায়, বিপরীতে যেই শিক্ষক বন্ধুসুলভ আচরণ করে, ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করে, সেই শিক্ষকের ক্লাশের অপেক্ষায় থাকে।

বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে যার অর্থ হলো যদি বন্ধু অথবা পরিবারের সদস্যরা ইতিবাচক সমর্থন করে, তাহলে ব্যক্তি সদাচরণ, সুন্দর মনের ব্যক্তিত্ববান হবে, জীবনে সফল হবে, আর সমান্য ভুলের জন্য বকা, পরীক্ষার আশানুরূপ ফলাফল না করলে, অসৎ সঙ্গ উল্টো দিকেই ধাবিত করে।

সুতরাং সুন্দর আচরণ, সুন্দর মনের চিন্তা ও জীবনের সাফল্যের জন্য নিজের চেষ্টা, পাশাপাশি পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকের ইতিবাচক সমর্থন ও উৎসাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ॥

পান্থশালায় আমিও ছিলাম

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

চুরুটের ধোঁয়াটে প্রশ্বাস মেখে
তেতো সুরায় গলা ভিজিয়ে
বিবর্ণ তক্তার শরীরে হেলান দিয়ে
আমি দেখছি...
গলায় গলায় সে এক অপার্থিব মাখামাখি!
হাসিতে খুশিতে লুটিয়ে পড়ার অভূতপূর্ব
মঞ্চায়ন,
এতোটা শোরগোল আর কোথাও দেখিনি
এমন অট্টহাসি বহুদিন শুনিনি
আলিঙ্গনে এতোটা দরদ কোনোদিন বুঝিনি।
অশ্রুজল তবে সুখেরও হয়?
বুঝিনি তো!
সেদিন ওরা যে গলাগলি করে কাঁদছিল
কতদিন পর দেখা!
জলপাইতলায় কতবার বউ সেজেছিল
অথচ জীবনচক্রে আজ কে কোথায়!
সেসব কি ভোলা যায়?

লোহার শিকের মত বিঁধতে থাকা শীতের রাতে
যারা ছাঁদের নিচে আগুন পোহাচ্ছিল,
চুরুটের মাদকতা ছড়িয়ে দিচ্ছিল রক্ত শিরায়,
তারা কি জানতো, যোসেফ তখনও দ্বারে
দ্বারে ঘুরছেন?
আমিও জানতে পারিনি।
মধ্যরাতে গোয়ালঘরে সে কী মহোৎসব!
দূতেরা মহোল্লাসে গান গেয়েছিল
তাদের গান কেউ শোনেনি,
রাখলেরা ছুটে এসেছিল গ্রামে
তাদের উল্লাসে কেউ কান পাতেনি,
গোয়ালঘরের পশুগুলো ডেকে উঠেছিল বার বার,
পানাহারের উন্মত্ততা ছাপিয়ে গিয়েছিল
সবকিছুকে;
আমিও তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম।
ঈশ্বরকে কি মত্ত কোলাহলে পাওয়া যায়?
নির্জনে, নিভৃতে, কোমলতায়
কিন্তু হৃদয়ের কোলাহল থামবে কে?

ভ্রমণকাহিনী

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ

মঞ্জু শিশিলিয়া গমেজ

২ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ আমি হযরত শাহ্জালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ঢাকার এর উদ্দেশে সকাল ১০টায় ঘর ছাড়ি। যাব অস্ট্রেলিয়া মালেশিয়ান এয়ারলইনস এ। প্লেন ছাড়বে দুপুর ১২:৪০ মিনিটে। যথা সময়ে বিমান বন্দরে পৌঁছালাম।

আমি একজন হুইল চেয়ার প্যাসেঞ্জার হওয়াতে বিমান বন্দরে ঢোকার সাথে সাথেই আমাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল। এরপর মালপত্র স্ক্যানিং এর পর ওজন দিয়ে স্ক্যানিং বোর্ডিং পাস নিয়ে ইমিগ্রেশনে যাই। পরে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে ওয়েটিং রুমে বসি। নির্দিষ্ট সময় হুইল চেয়ার চালক এসে আমাকে প্লেনে তুলে দিল। প্লেনে এয়ার হোস্টেজের নির্দেশে নির্দিষ্ট সীটে বসলাম। উনি আমাকে বললেন, প্লেন ল্যান্ড করলে আমি যেন একা না নামি। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট সময়ে প্লেন রানওয়েতে দৌঁড়ানো শুরু করল। সিট বেল্ট বেঁধে প্রার্থনা করলাম নিরাপদ যাত্রার জন্য। প্লেন উড়তে শুরু করল। অবশ্য এটা আমার প্রথম আকাশ ভ্রমণ নয়। বার বছর পর আবার প্লেনে উঠেছি প্লেন চলছে। ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠছে; এ ভাবেই চলছি। বিভিন্ন সময় খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। মালেশিয়ান সময় সন্ধ্যা ৬:২৫ মিনিটে প্লেন কুয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল। সব যাত্রী নামার পর হোস্টেজ এসে আমার ট্রলী নামিয়ে প্লেনের দরজায় অপেক্ষমান হুইল চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিলেন। চালক আমাকে নিয়ে চলল। কুয়ালালামপুরের চাকচিক্যময় এয়ারপোর্ট দেখতে দেখতে আমি চলতে থাকলাম। এক সময় চালক আমাকে এক জায়গায় বসিয়ে বলল "you wait here, I'll come in right time" আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। নির্দিষ্ট সময় হুইল চেয়ার চালক এসে আমাকে গেটে নিয়ে গেল। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে আর একটি প্ল্যাটফরমে নেমে প্লেনের দিকে এগুতে থাকি। এক সময় প্লেনে উঠি। এবার যাত্রা কুয়ালালামপুর টু অস্ট্রেলিয়া। আট ঘন্টা চলবে প্লেন। সময়মত প্লেন উড়ে চলল। বাইরে তখন অন্ধকার। যখন ভোর হতে শুরু করল তখন জানালা দিয়ে ভোরের আকাশ দেখতে থাকলাম। স্তুপ স্তুপ মেঘের ভেতর দিয়ে প্লেন চলছে। মাঝে মাঝে নড়ছে। একটু ভয়ও লাগছে, ধীরে ধীরে সূর্যের লাল আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশ লাল আকার ধারণ করছে। অদ্ভুত লাগছিল। অবশেষে সকাল ৭:৫৫ মিনিটে প্লেন অস্ট্রেলিয়ার তুলামেরিন এয়ারপোর্টে নামল। আমার মনে দারুণ উচ্ছাস। কতক্ষণে নামব। নতুন দেশে এসেছি। এখানে কিন্তু প্লেনের দরজায় হুইল চেয়ার ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে হল। নেমে চারিদিক একবার দেখে নিলাম। জুন মাস। অস্ট্রেলিয়ায় শীত। ঠাণ্ডা বাতাস হাতের wind proof জ্যাকেটটি গায়ে দিলাম। এরপর বাসে উঠিয়ে আমাদের মেইন টার্মিনালে নেয়া হল। সেখান থেকে জীপের মত ছোট গাড়ীতে করে কাষ্টমস পর্যন্ত দিয়ে বেল্ট থেকে মালামাল ট্রলিতে চাপিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বের হই। বাইরে অপেক্ষমান আমার মেয়ে ও জামাই এর সাথে গাড়ীতে করে ভিক্টোরিয়ায় মেলবোর্নে অবস্থিত clayton city র দিকে রওনা দেই। পথে একটি নদীর নীচ দিয়ে ব্রীজ পার হয়ে প্রায় আধাঘন্টা পর আমরা clayton city তে পৌঁছি। প্রথমেই আবাক হয়েছি সর্বত্র গাছ আর গাছ দেখে। বড় বড় রাস্তা। চওড়া আইল্যান্ড বড় বড় গাছ, বিরাণ খালি জায়গা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও ট্রাফিক পুলিশ নেই। সবাই যার যার মত গাড়ী চালায়। কিছুদূর পর পর আছে সিসি ক্যামেরা। জুন মাস আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল আর অস্ট্রেলিয়াতে শীতকাল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। মাথায় টুপি, হাতে গ্লাবস, পায়ে জুতা-মোজা, গায়ে সোয়েটার, wind proof জ্যাকেট পড়ে বের হতাম। এখানে শীতের সময় আকাশ প্রায়ই মেঘলা থাকে আর প্রচুর বৃষ্টি হয় এতে ঠাণ্ডা বেড়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়ার চারপাশ ঘিরে যেহেতু সমুদ্র সুতরাং বীচেরও অভাব নেই। একদিন বিকেলে clayton শহরের কাছাকাছি Menton বীচে ঘুরতে যাই। এ বীচের তিন দিকে অনেক দূর পর্যন্ত স্থলভূমি দিয়ে ঘেরা। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হল সমুদ্র ঢেউ ছিল ছোট আর সমুদ্রও মোটামুটি শান্ত ছিল।

আমার মেয়ে মনাস ইউনিভার্সিটিতে Education এ PHD করছে। ওর স্বামীও একই বিষয়ে PHD করছে। ১৮ জুন ২০১৩ আমার নাতি হল SANDORINGHAM হাসপাতালে। বাসা থেকে আধা ঘন্টা ড্রাইভ। ১২ জুলাই আমি প্লেনে দেড় ঘন্টায় সিডনী যাই। সেখানে করুণা বৌদি ও তার মেয়ে সীমা আমাকে এয়ারপোর্টে গ্রহণ করতে আসে। তাদের সাথে আমি সীমাদের বাড়ী RYDE এ আসি। এখানে আসতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লেগেছে। পরদিন সুশীলদা, করুণা বৌদি, সীমা ওর স্বামী ডেভিড ও আমি অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অপেরা হাইস, হারবর ব্রীজ আর্ট গ্যালারী দেখতে যাই। রাতে ফেরার পথে হারবার ব্রীজের উপর দিয়ে আসি। রাতে বাতির ঝলমলে আলোর দৃশ্য ভুলবার নয়। ১৪ তারিখ যাই ব্লু মাউন্টেন ও থ্রি সিস্টারস দেখতে। বনে বনে ভরা পর্বতমালা দূর থেকে দেখতে নীলাভ লাগে তাই এর নাম ব্লু মাউন্টেন। চারিদিকে ঘন বন আর বন। ট্রেনে করেও উপর থেকে নীচে নামা যায়। ১৬ জুলাই West Mead এ যাই সুজিৎ শশী এবং ধর্মছেলে সুব্রত ও মিনতির ঘরে। ১৬ তারিখ সুশীলদা করুণা বৌদির বাসা এ্যাসকুইথে। ঐদিনই রাত আটটার ফ্লাইটে মেলবোর্ন ফিরে আসি। ২৭-৭-১৩ তারিখ আমার ছেলের বন্ধু রুশো ও তার স্ত্রী মম এল আমাকে মেলবোর্নের আরও একটি শহর জিলং নিয়ে যেতে। আমরা রাত ১১:১৫ মিনিটে রওনা দেই। রাতের মেলবোর্ন অদ্ভুত সুন্দর। চারিদিকে বৈদ্যুতিক বাতির

ঝিলিমিলি রূপ। আমরা যখন ইয়ারা নদীর মাঝখানে ছিলাম তখন অপর প্রান্তে মেলবোর্ন সিটির ঝলমলে অপূর্ব রূপ দেখলাম। এভাবে রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি কোথাও মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আমরা রাত ১টার দিকে জিলং পৌঁছি। পরদিন সকালে চা-নাস্তা সেরে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়ি। প্রথমে যাই হাইটন। সেখানে বাকলী ফলস এর অপর পাশে পৃথিবীর প্রথম ফ্রীজ ফ্যাক্টরী (যা বর্তমানে এ্যানটিক হিসেবে আছে) দেখে QUEEN'S BRIDGE (one lane) পার হই। এ ব্রীজটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরী। স্থানীয় লোকজন এটা ভাঙ্গতে দেয়নি। এর পর জিলং এর Eastern Beach এর পথ ধরে জিলং এর আদি বন্দর কানিং হেম পিয়েরে আসি। এটা হল জিলং এর উল ব্যবসায়ের মূল কেন্দ্র। এখন চলছি Torquay (টর্কির) দিকে। পথে পড়ল Cats এর ফুটি স্টেডিয়াম ফুটি খেলার বল দেখতে রাগবি বলের মত। ফুটি অস্ট্রেলিয়ানদের জনপ্রিয় খেলা।

টর্কিতে দেখলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত আরেকটি ব্রীজ। এখানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সৈন্যরা অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ করতে আসলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের আর্মি কোর (ANZ-AC) এক সঙ্গে যুদ্ধ করে জাপানী সেনাদের পরাজিত করে। সে ঘটনাকে ধরে রাখার জন্য এখানে আছে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী শহীদদের প্রতি উৎসর্গীকৃত স্মৃতিসৌধ। এরপর চলছি Lorn (ছোট শহর) এর দিকে। পথে পড়ল Great Ocean Road' গেট। নেমে ছবি তুললাম। দুপুর ২টায় Lorn পৌঁছে "চপ স্টিকস' নামক একটি চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেয়ে নীচে নেমে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে হাঁটলাম। বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে ঠিক যেন কক্সবাজারের মত। দেখলাম হলুদ ঝুঁটিওয়ালা সাদা কাকাতুয়া পাখি। টেবিলে বসে খাবার খেতে ব্যস্ত মানুষদের পাশে ওরাও এসে ভিড় করে। এ দেশের পশু পাখি মানুষকে ভয় পায় না কারণ মানুষ ওদের কোন ক্ষতি করে না। আবার গাড়ীতে উঠলাম।

৩৬০ ডিগ্রী ঘুরে Apollo bay হয়ে চলছি Port Camble National Park'র দিকে বায়ে সমুদ্র ডানে সুউচ্চ পাহাড় বন। পথে পড়ল Otowhy National Park এক সময় সমুদ্রের ধার থেকে বনের ভেতরের রাস্তায় ঢুকলাম। রাস্তার দু'পাশে ৫০/৬০ ফুট লম্বা গাছ গুলো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। যাবার পথে Cambarland, George, Kennet ইত্যাদি নদী গুলোর পাশ দিয়ে গেলাম। এবার Apollo শহরে ঢুকার পথে চারণ ভূমিতে গরু-ভেড়ার পাল চড়ছে। অনেক ভেড়ার লোম চেছে নেয়া হয়েছে উল তৈরীর জন্য। দু'পাশে Valley আর Valley আবার উপত্যকা দিয়ে চলছি ডানে অভয়ারণ্য। অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পুরো রাস্তাই Great Ocean Road এ রাস্তা পুরোটাই Bass Strait (A Part of Pacific Ocean) সমুদ্রের পাশ দিয়ে গেছে। Bass Strait সমুদ্রই অস্ট্রেলিয়াকে তাসমানিয়া থেকে আলাদা করেছে। এবার ঢুকলাম Prince Town নামে একটি ছোট শহরে। এখানে অল্প ঘর বাড়ী একটাই দোকান নাম "New Zeeland Milk Bar Dairy" বাজার পোষ্ট অফিস Cross করে আবার সমুদ্রে ধারের রাস্তায় আসলাম। চলতে চলতে এক সময় Port Camble National পার্কের কাছে পৌঁছলাম। গাড়ী পার্ক করে আমরা সমুদ্রের পাড়ে গেলাম পাড় অনেক উচুঁ। শক্ত মোটা তারের বেষ্টনী চারপাশে। এখানে সমুদ্র গর্ভে দেখা যায় বিখ্যাত Twelve Apostels প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী হয়েছে বারটি পাথুরে স্তম্ভ যা দেখতে মানুষ দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসে। এ স্তম্ভগুলোকে আদিবাসী অস্ট্রেলিয়ানরা বলত Twelve Brothers (বার ভাই) কিন্তু পরে নাম দেয়া হয়েছে Twelve Apostels (বার শিষ্য) বারটির মধ্যে আটটি স্তম্ভ টিকে আছে বাকী গুলো পানির আঘাতে ভেঙ্গে গেছে।

এবার ফেরার পালা। তবে রাত হয়ে যাবার কারণে স্থলভাগের ভেতরের রাস্তা দিয়ে কোলাক শহর হয়ে Sceantc Road দিয়ে আমরা রাত ৯:৩০ মিনিটে জিলং ফিরে আসি। রাস্তার পাশে Bimmonds Stadium এ ফুটি খেলা চলছিল। এ এলাকা সম্বন্ধে এত কিছু জানা সম্ভব হয়েছে রুশোর কাছ থেকে কারণ রুশো এক সময় এ এলাকায় কাজ করত।

একদিন মেলবোর্ন সিটিতে যাই। সেখানে ইয়ারা নদীর ডকের উপর অনেকদূর হাঁটলাম। নদীতে বিলাস ভ্রমনের জন্য অনেক প্রমোদ তরী থাকে। Sky Desk নামে ৮৮ তলা বিল্ডিং ও লিফটে মাত্র ৩/৪ মিনিটের মধ্যে উঠে যাই। উপর থেকে পুরো মেলবোর্ন দেখা যায়। আর রাস্তার গাড়ী ও প্রমোদ তরীগুলোকে ছোট ছোট খেলনার মত মনে হয়।

এভাবে বিভিন্ন জয়গায় ও আত্মীয় স্বজনদের বাসায় ঘুরে বেরিয়ে তিন মাস পর বাংলাদেশে ফিরে আসি॥

তূরীধ্বনী

পিটার রোজারিও

ধন্য সাধু যোহন করেন প্রচার জনে জনে
মহামানব আসবেন শীঘ্র এ ভুবনে।
মারীয়ার নিকট বার্তা আনেন মহাদূত গাব্রিয়েল
মানবজাতীর ত্রাণকর্তা আসবেন তাঁরই গর্ভে।
দূতের মুখে সংবাদ শুনে মারীয়া ভয় পায়
সদাপ্রভু আছেন তাঁর সাথে দূত তা জানায়।
খ্রিস্টযিশু জন্ম নিলেন গোয়াল ঘরেতে
হলোনা জন্ম তার কোন রাজ প্রাসাদে।
সংবাদ শুনে ছুটে যায় রাখালের দল
ভক্তি করেন সকলে ধরে তাঁর চরণ।
স্বর্গ থেকে দূতেরা তূরীধ্বনী বাজায়
সেই ধ্বনী চারিদিক আনন্দে ভাসায়।
পূর্বদেশের তিন পণ্ডিত ছুটে আসেন
দেখে আকাশের তারা
হঠাৎ তা নিভে যায় হয় তাঁরা
দিশাহারা।
সংবাদ শুনে হেরোদ রাজা মনে ভয় পায়
শিশুটির দেখা পেলে যেন তাঁকে
জানায়।
আবার তাঁদের চোখে পড়ে সেই উজ্জ্বল তারা
গোয়াল ঘরে পৌঁছে প্রভুর পূজা করেন তাঁরা।
স্বর্গের দূত তাঁদের বলে, ফিরে যাও
অন্য পথ ধরে
হেরদ রাজা তাঁকে ফেলবে মেরে যদি
জানতে পারে।
দূতের আদেশ শুনে তাঁরা নতুন পথ ধরে
ত্রাণকর্তার পূজা করে আনন্দে ঘরে ফিরে॥

মুক্তিযুদ্ধ ও বীরাঙ্গনা সাহসিনীর গল্প

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

এমিরেট্স এয়ারওয়েজের বিমান উড়াল দিয়েছে দু'ঘন্টা হতে চল্‌লো। অনেক বছর পর দেশে যাচ্ছি। পাশে বসা কাচা-পাকা চুলের এক ভদ্রলোক। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছেন। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। যাত্রাপথে কারও সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। এদিক থেকে আমার স্ত্রী আবার আলাদা। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যে আশে-পাশের যাত্রীদের সাথে আলাপে এমন মত্ত হবে, মনে হবে তারা যেন কতদিনের পরিচিত। ভদ্রলোকটিও কোন কথা বলছেন না। ভদ্রলোক আমার সমগোত্রীয় হবেন হয়তো বা।

আলাপ শুরুর কোন সুযোগ নেই ভেবে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একটি বই খুলে বসি। খেয়াল করি ম্যাগাজিন থেকে ভদ্রলোকের চোখ সরে যাচ্ছে। আড়-চোখে আমার হাতের বইয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে আমার দিকেও। আমি না বুঝার ভান করি। ভদ্রলোক বেশীক্ষণ কৌতুহল ধরে রাখতে পারলেন না। কথা বলা শুরু করলেন।

- ভাইজান, একটু কথা বলতে পারি?
- আমি বলি, কেন নয়? অবশ্যই পারেন।
- আপনি কি বাংলাদশে যাচ্ছেন?
- হুঁ, বাংলাদেশে যাচ্ছি।

  অল্প কথায় উত্তর দিচ্ছি কারণ বইয়ের একটি ইন্টারেস্টিং জায়গায় চলে এসেছি। আলাপ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ভদ্রলোক থামবেন বলে মনে হয় না।
- আপনার হাতে মুক্তিযুদ্ধের বই দেখেই বুঝতে পেরেছি, আপনি বাংলাদেশের লোক। মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ছেন। তো, দেশে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান নিয়ে এখন আর কেউ ভাবে বলে কি আপনার মনে হয়?
- অবশ্যই ভাবে। ভাবনার মধ্যে তফাৎ থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস অদ্যাবধি কেউ অর্জন করেনি।
- ভাই, মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?
- দেশে ছিলাম। আমি, আমার বড় চাচা এবং আমার একমাত্র মামা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার মামা যুদ্ধে একটি পা হারিয়েছেন।
- বলেন কি ভাইজান? আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার পাশে বসে আছি? দয়া করে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কোন অভিজ্ঞতার কথা বলবেন কি? মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি দেশে ছিলাম না। বই পড়ারও অভ্যাস নেই। তাই লোকের মুখে যতটুকু শুনেছি ততটুকুই আমার জ্ঞান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কলেজ পড়ুয়া বোনকে রাজাকারদের সহযোগিতায় পাক-আর্মি ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। সরল-সহজ, সুন্দরী মেয়ে স্মিতা। অনেক খোঁজ করেও স্মিতার সন্ধান পাওয়া যায়নি।

  স্মিতার কথা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের গলা ধরে আসে। ক্ষণিকের জন্য কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকাই। ভদ্রলোকের হৃদয়ের কষ্টের গভীরতা মাপার চেষ্টা করি। কৌতুহলী মনে প্রশ্ন জাগে- স্মিতা কি ভদ্রলোকের ভালোবাসার মানবী ছিলো? কষ্টে কৌতুহল দমন করি।

  এক আশ্চর্য দক্ষতায় মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলেন ভদ্রলোক। চোখের চশমাটি ঠিক করার অনর্থক চেষ্টা করে আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন-
- আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সাথে দেখা হলো। ভাই, বলেন না কোন একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা।
- মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তো আমার অনেক স্মৃতি। অনেক কথা। বলে শেষ করা যাবে না। তবে আমার দাদু এবং একজন বীরাঙ্গনার কথা বলতে পারি।
- বলেন, বলেন। ভদ্রলোক মহা উৎসাহে নড়ে-চড়ে বসেন।

  আমি বলা শুরু করি। আমাদের গ্রামের নাম ছাতিয়ানতলা। গাইবান্ধা শহর থেকে নয় কিলোমিটার উত্তরে গ্রামটির অবস্থান। গ্রামের পথ ধরে হাঁটলে চারিদিকে সবুজের সমারোহ চোখে পড়ে। গ্রামে সৃজনশীল ও মননশীল বিনোদনের অন্য কোন মাধ্যম না থাকাতে আমার বাবার গড়া পাঠাগারটি গ্রামের মানুষের ভালোবাসার জায়গায় পরিনত হয়েছিলো। গ্রামে লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা হাতে গোনা। উচ্চ শিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। লেখা-পড়া জানা এবং লেখা-পড়া না জানা সকলেই লাইব্রেরীতে আসে। যারা পড়তে পারে তারা বই নিয়ে পড়ে। অন্যরা ছবি দেখে। পড়ুয়াদের সাথে পড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আলোচনা পড়ার বাইরেও হয়। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা থেকে শুরু করে দেশের হাল-হকিকত নিয়েও আলোচনা চলে এ লাইব্রেরীতে।

  বাবা পাশের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। বই পড়ার প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক। বইয়ের পোকা বলতে যা বোঝায় আর কি। রাস্তায় কাগজ পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে পড়েন। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে জমিয়ে লাইব্রেরীটি গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে বইয়ের সংগ্রহ বৃদ্ধির বাবার যে বিরামহীন প্রচেষ্টা সত্যিই তা অবাক করার মতো।

  ঊণসত্তুরের গণ-আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকগণ ক্লাশ বন্ধ রেখে রাজপথের আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আমিও একজন সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসাবে আন্দোলনে অংশ নিচ্ছি। বাড়িতে জানাইনি। কিন্তু বাবা ঠিকই খবর পেয়ে যান। খবরটা দেয় সালামত মুন্সী। হাড়-বজ্জাত লোক। আইয়ুব খানের কট্টর সমর্থক। সুযোগ পেলেই বাঙালি আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের চৌদ্দ-গুষ্টি উদ্ধার করে। ঢাকা থেকে ফিরে গ্রামে বেশ দায়িত্ব নিয়েই রটায়-
- সোহরাব হোসেনের ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। আমি নিজ চক্ষে ও'কে শাহবাগে মিছিলে জয়বাংলা স্লোগান দিতে দেখেছি। হায়রে জয়বাংলা! হায়রে সোহরাব! সোনার টুকরো ছেলেটারে পাঠালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। অথচ ফিরে আসবে পুড়ে কয়লার টুকরো হয়ে। আইয়ুবের তাপতো এসব ছেলে-ছোকরারা বুঝে নাই। সব কয়লা হয়ে যাবে.. কয়লা..

আইয়ুব খানের তাপে কাজ হয় না। তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতায় আসে। ইয়াহিয়াও আইয়ুব খানের পথে হাঁটে। বাঙালির ন্যায্য দাবী মানতে চায় না। সংখ্যা গরিষ্ঠ জনমতকে অগ্রাহ্য করে। বাঙালির মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে বাঙালিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ২৫ মার্চ রাতে গণ-হত্যা চালায় ইয়াহিয়ার বাহিনী।

বীর বাঙালি রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। আমি বড় চাচার সাথে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যাই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিতে। বাবাকে বলি। বাবা বাঁধা দেন না।

উল্টো বাবার চোখে-মুখে আলোর ঝল্‌কানি দেখতে পাই। ছেলে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে যাচ্ছে। এতো গর্বের বিষয়। মা অসুস্থ। গর্ভবতী। ছয় মাস চলছে। তাই মাকে বলা হয়নি। যুদ্ধে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মা'র কথা ভেবে বাবা বাড়িতে থেকে যান।

সালামত মুন্সী তক্কে তক্কে ছিলেন। ঠিকই খবর বের করে ফেলেন। রাজাকাররা বাবাকে না পেয়ে আমার দাদুকে ধরে নিয়ে যায়। চাচা-ভাতিজার খবর বের করার জন্য রাজাকার ক্যাম্পে বেঁধে রেখে দিনের পর দিন বৃদ্ধ লোকটির উপর অকথ্য নির্যাতন করে।

এমনি এক কষ্টের দিনে শীতের কুয়াশার ভোরে বাবা আমার অসুস্থ মা এবং ছোট ভাই-বোনকে নিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হন। তখন আমন ধানের চাষ হতো ব্যাপক। লম্বা শীষওয়ালা ধানের ক্ষেত পেরিয়ে বাবা-মা, ভাই-বোনরা পৌঁছেছিলো অন্য গ্রামে। ধানের শীষের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো আমার মা ও ভাই-বোনের পা।

যুদ্ধের ভয়াবহতা বেড়েই চলছিলো। রাজাকাররা আমার দাদুকে আধা-মরা অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের গ্রামের বাড়িতে চালিয়েছিলো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুট-পাট। অগ্নি-সংযোগ করা হয়েছিলো ধানের গোলায়, উঠোনে কেটে রাখা ধানের স্তূপে।

আমার বাবা পাশের গ্রাম ছেড়ে মা, ভাই-বোনদের নিয়ে চলে যান নীলফামারী আমার বড় খালার বাড়িতে। সেখানে পনের দিনের মতো থাকার পর জানা গেল আমাদের গ্রামের দিককার অবস্থা ভাল। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে অনেক পাকআর্মি ও রাজাকার মারা গেছে।

বাবা-মা ফিরলেন বাড়িতে। মা গোছাতে শুরু করলেন সংসার। লাইব্রেরীটা বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে রাস্তার পাশে। যুদ্ধের শুরু থেকেই লাইব্রেরীটা তালা লাগানো। কেউ খোঁজ নেয় না। বাবা লাইব্রেরী খুলে ঘসা-মাজা করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন।

যুদ্ধের সময় অনেকেই মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলো। বিলে-ঝিলে, নদীতে তখন সর্বত্রই মানুষের লাশ। নদীর কিনারে আটকে থাকা ভেসে আসা লাশ বাঁশের লগি দিয়ে ভাসিয়ে দিতেন আমার বাবা। কার লাশ। স্বজন কারা। কেউ জানে না। কেউ খোঁজ নিতেও আসতো না।

সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো। আমাদের এলাকায় হয়তো বা আর কোন ঝামেলা হবে না। তখনই আসলো ভয়ংকর সংবাদ। রাজাকার ও পাক-বাহিনী যৌথভাবে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে দিতে এদিকটায় আসছে। সকলে পালাচ্ছে। দাদু, ভাই-বোন আর অসুস্থ্য মাকে নিয়ে বাবা দ্বিতীয় বারের মতো গ্রাম ছাড়লো।

পাক-বাহিনী রাজাকারদের সহায়তায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। লুট-পাট চালায়। ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমাদের গ্রামের কালাচান ও মোর্শেদ চাচা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে । পাশের বাড়ির দুলু মিয়ার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলো। উঠোনে ধান রোদে দেয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হন।

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শেষে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের তীব্র আক্রমনে পাকবাহিনী চোখে অন্ধকার দেখে। অনেক পাকআর্মি নিহত হয়। অন্যরা পালিয়ে বাঁচে। গাইবান্ধা শত্রুমুক্ত হয়।

মুক্তির আনন্দে আত্মহারা মানুষ গ্রামে ফিরে আসে। বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই বাবা তাঁর প্রিয় লাইব্রেরীতে যান। লাইব্রেরীর দরোজা খোলা। ভেতর থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ আসছে। আঙ্গুলে নাক চেপে বাবা ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করেন। চেয়ার-টেবিল উল্টানো। বই-পত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। মেঝেতে বই-পত্রে রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে। লাইব্রেরীর কোনায় একটি বিধ্বস্ত-বিবস্ত্র নারী দেহ পড়ে আছে। মাছি ভন্ ভন্ করছে। যেন হিংস্র বাঘ আর শকুন মিলে মেয়েটির দেহ খুবলে খেয়েছে। বাবা দাঁড়াতে পারেন না। দৌড়ে বাড়ি চলে আসেন। হাঁফাতে হাঁফাতে মা'কে বলেন। মা পাশের বাড়ির চাচীকে নিয়ে লাইব্রেরীর দিকে ছুটেন। এক কান, দু-কান করে বিষয়টি জানাজানি হতে সময় লাগে না। লাইব্রেরী ঘিরে ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠে, বেঁচে আছে, বেঁচে আছে..। কামাল চাচা ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তিনি বিধ্বস্ত নিথর মেয়েটির কাছে যান। ভালো করে দেখে বলেন-

- সোহরাব, মেয়েটি বেঁচে আছে। খুব ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস চল্‌ছে।

বাবা চিন্তায় পড়ে যান। গ্রাম-জুড়ে সন্ধ্যা নামছে। এ গণ্ডগ্রামে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে নিয়ে তিনি কি করবেন। তাঁর লাইব্রেরীতে পাওয়া গেছে তাই দায় যেন পুরোটাই তাঁর। গ্রামের কেউ দায়িত্ব নেবে না। লাইব্রেরীটা যে গ্রামের মানুষের জন্যই করা হয়েছে, সেটা সকলেই বেমালুম ভুলে বসে আছে। মুক্তিযোদ্ধারাও কেউ ফেরেনি। ও'রা থাকলে কোন চিন্তা করতে হতো না। বাবা চোখে অন্ধকার দেখেন।

হারিকেন নিয়ে দাদুকে আসতে দেখে সকলে সরে পথ করে দেয়। দাদু মেয়েটির কাছে যান। সাথে নিয়ে আসা চাদর দিয়ে মেয়েটির শরীর ঢেকে দেন। তারপর দাঁড়িয়ে সকলের উদ্দেশে বলেন-

- এ মেয়েটি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাড়িতেই থাকবে। ও'র উপরদিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তাতে ও'র কোন দোষ নেই। ও' পবিত্র। রাজাকাররা আমাকেও তো বেঁধে রেখে অত্যাচার করেছে। আমাকে কী তোমরা পরিত্যাগ করেছো? করো নাই। মেয়েটিকে আমরা সুস্থ করে ও'র স্বজনদের নিকট পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো। যদি স্বজনদের খোঁজ পাই ভালো। না পেলে মেয়েটি আমাদের বাড়িতেই থাকবে। আমার নাতনীর মতো।

বাবার চোখে পানি চলে আসে। দাদু বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলেন-

- সোহরাব, যুদ্ধের পর স্বাধীন দেশ গড়ার সময়ে এমন ছোট-বড় অনেক দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে। সকলকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ভুল করা চলবে না। ভুল করলে স্বাধীনতা বিরোধীরা হাসাহাসি করবে।

অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটিকে বাঁচানো গেল না। পনেরো দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সকলকে কাঁদিয়ে নাম না জানা মেয়েটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে মেয়েটিকে সমাহিত করা হয়। দাদু কবরটি ইট-বালি-সিমেন্ট দিয়ে সুন্দর করে বাঁধিয়ে শ্বেত-পাথরের উপর লিখেন-" এখানে বীরাঙ্গনা সাহসিনী ঘুমিয়ে আছেন। জন্ম: জানা নেই; মৃত্যু: ডিসেম্বর ৩১, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ।

দাদু মৃত্যুর পূর্বে লাইব্রেরীর জায়গাটিসহ আরও বেশ কিছু জমি বীরাঙ্গনা সাহসিনী'র নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য লিখে দিয়ে যান। বাবা তাঁর জীবদ্দশায় স্কুলের কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। আমি যুক্তরাষ্ট্রে এসে গ্রামের লোকদের সহযোগিতায় বাকি কাজ সমাপ্ত করেছি। আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে স্কুলটি উদ্বোধন হবে। স্কুলটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য আমি দেশে যাচ্ছি।

আমি ব্যাগ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি আমন্ত্রণপত্র বের করে ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলি-

- এটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র। ঠিকানাসহ অনুষ্ঠানসূচী লেখা আছে। আপনাকে আমি আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি আসলে ভীষণ খুশি হবো। কী, আসবেন তো বীরাঙ্গনা সাহসিনী স্কুলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে?

ভদ্রলোক ছল্‌ছল্ চোখে একবার আমার দিকে একবার আমন্ত্রণ পত্রটির দিকে তাকাচ্ছেন। দীর্ঘদিন হৃদয়ে জমে থাকা কষ্ট চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। হঠাৎ কষ্টের বাধ ভেঙ্গে যায়। কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে আমন্ত্রণ পত্রটির উপর পড়তে থাকে ফোঁটায় ফোঁটায়॥

স্বাধীনের গল্প

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

শীতের সকাল। তারপরও সকাল হতেই নীল আকাশটা বেশ মেঘাচ্ছন্ন। সূর্য একটু উকি দিয়ে আবার যেন লজ্জাবতী মেয়ের মতো ঘোমটা দিচ্ছে। সেই সুযোগে স্বাধীন আজ স্কুলে না যেতে বেশ টালবাহানা শুরু করলো। কিন্তু মায়ের কঠোর ধমকে সে অবশেষে ভীষন্ন মনে স্কুল ব্যাগ নিয়ে স্কুলের পথে পা বাড়ালো। স্কুলে এসে তার সব বন্ধুদের কাছে পেয়ে মায়ের ধমক খাওয়ার কথা ভুলে বেশ আনন্দেই মেতে উঠল। আকাশটা মেঘলা থাকায় স্কুলের দূরে অবস্থানরত ছাত্ররা অনেকেই আজ স্কুলে অনুপস্থিত। প্রথম পিরিয়ডের ক্লাসে এলেন ইংরেজি শিক্ষক গণেশ স্যার। ছাত্র কম থাকায় ইংরেজি সাহিত্যের গল্পে সময় পার করলেন কিন্তু দ্বিতীয় পিরিয়ডে লিও স্যার শারীরিক অসুস্থতার কারণে ক্লাস নিতে পারেনি। সে সুযোগে ছাত্ররা চুটিয়ে গল্প করছে ও হাতাহাতি খেলায় মেতে উঠেছে। স্কুল ঢাকা সিলেট মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে অবস্থান করায় সারাক্ষণ গাড়ীর হর্ণ ও দক্ষিণা হাওয়া হুহু করে ক্লাসে ঢুকছে।

শিক্ষক ছাড়া দ্বিতীয় পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঢং ঢং ঘন্টা যথাসময়ে বেজে উঠলো। অতঃপর তৃতীয় পিরিয়ডের স্কুলের স্বনামধন্য মোড়ল স্যার গায়ে চাদর জড়িয়ে বাংলা ক্লাস করাতে এলেন। মোড়ল স্যারের বাড়ী স্কুলের খুব বেশি দূরে নয়। ভীষণ কড়া হলেও চমৎকার হাসি খুশি মানুষ। স্যার ক্লাসে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তা কিন্তু ছাত্ররা কোনভাবেই টের পেলো না কারণ ক্লাসের ছাত্ররা মিলে তখন হরতাল হরতাল খেলা করছিল এবং ভীষণ ভাবে চেচাচ্ছিল। হরতাল খেলায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল ক্লাসের দুষ্টু ছাত্র হিসেবে পরিচিত গোপাল। সব দেখে জোরে একটা কাশির ভান করে ক্লাসে প্রবেশ করলেন স্যার। ছাত্ররা শান্ত হয়ে নিজ নিজ সিটে বসলো।

স্যার সবাইকে দাঁড় করায়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আমার আসার আগে ক্লাসে কি করছিলে? সবাই তখন একদম নীরব তোমরা সত্য করে বলো তা নাহলে আমি তোমাদের সবাইকে এমন কঠিন শাস্তি দেব যা আজীবন তোমাদের মনে থাকবে। অবশেষে স্বাধীন অতি সাহস করে বললো, স্যার আমরা হরতাল হরতাল খেলছিলাম। তোমাদের হরতাল খেলায় কে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো? গোপাল নেতৃত্ব দিচ্ছিলো। স্যার গোপালকে সামনে এনে দাঁড় করালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, গোপাল তুমি এই হরতাল হরতাল খেলা কোথা হতে শিখলে? গোপাল বললো, 'স্যার আজকাল প্রায়ই টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে হরতালের মিছিল দেখায় আমি তা দেখেই শিখে ফেললাম'। তোমরা কি জানোনা, রাত পোহালে আমাদের মহান বিজয় দিবস আর তোমরা আজ হরতাল হরতাল খেলায় মেতে উঠলে!!! ছি! ছি! ছি! এইতো ভীষণ লজ্জার কথা। তোমরা কি টিভিতে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কোন ছবি দেখনা? মুক্তিযুদ্ধের কোন গল্পও কি শোননা? তোমরা কে কে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনেছ হাত তোল দেখি। সেই দিন উপস্থিত পচিশ জন ছাত্র হতে মাত্র দশ জন ছাত্র হাত তুললো আর বাকিরা বোকার মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। স্যার তখন বললো তোমরা পনের জন কি মুক্তিযুদ্ধের কোন গল্পও শুননি? যে দশ জন মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনেছ তাদের মধ্য হতে এক জন মুক্তিযোদ্ধের একটি গল্প সুন্দর করে বলবে। ভাল করে বলতে না পারলে কিন্তু আজ ক্লাসে সবাইকে কান ধরে দাঁড় করিয়ে রাখবো। স্বাধীন অতি শান্ত ভাবে সামনে এসে তার শোনা মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুরু করলো।

"আমার কাকা একজন মুক্তিযুদ্ধা ছিলেন। আমার ঠাকুরমার কাছ হতে শোনা গল্পে আমি জেনেছি, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমার কাকু তখন বান্দুরা সেমিনারিয়ান হিসেবে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তখন স্বাধীনতার জন্য সারা বাংলায় হরতাল অবরোধ ও মিছিল মিটিং চলছিল। পশ্চিমা সেনারা রাতের আধাঁরে ২৫ মার্চ কালরাত্রিতে বাংলার নিরীহ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার কাকু অনেক কষ্টে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বান্দুরা হতে বাড়ি ফিরে আসেন। সারা বাংলায় তখন মুক্তিযুদ্ধ চলছিলো। জুন মাসের ২৫ তারিখ সন্ধ্যার পর হতে আমার কাকুকে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সব আত্মীয়দের বাড়িতে খোঁজ নিয়েও তার খবর পাওয়া গেল না। দুই সপ্তাহ পর জানতে পারলো, কাকু রাতের আধারে কাউকে না বলে বাড়ি হতে পালিয়ে মুক্তিযোদ্ধের ট্রেনিং নিতে ভারতে চলে গেছে। এর পর ট্রেনিং শেষ করে জুলাই মাসে কাকু দেশে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে। হঠাৎ এক রাতে কাকু বাড়িতে সবার সাথে গোপনে দেখা করতে এলেন। মুক্তিযুদ্ধও হলো। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হলো। অনেক মুক্তিযুদ্ধেরা মায়ের কোলে ফিরে এলো বীর মুক্তিযোদ্ধা হয়ে। কিন্তু আমার কাকু আর ফিরে এলোনা স্বাধীন দেশের স্বাধীন মাটিতে। আমার ঠাকুরমা কাকুর ফিরে আসার পথ চেয়ে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আজ ১২ বছর হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে ও শহীদ বীরমুক্তিযোদ্ধার গর্বিত মা হয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।"

বাকরখানি

সাগর কোড়াইয়া

পুরনো ঢাকার বাকরখানির কথা বলতেই লুসিয়া খাওয়ার বায়না ধরলো। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। অতঃপর বাকরখানি না খাওয়ানোর কারণে সম্পর্ক ভেঙ্গে যাওয়ার অবস্থা। অগ্যতা কি আর করা। দিন তারিখ ঠিক করলাম। লুসিয়াকে নিয়ে মহাসমারোহে পুরনো ঢাকায় যাবো বাকরখানি খেতে।

এর আগে আমার বাকরখানি খাওয়ার পটভূমিটা বলে নিই। লুসিয়ার বাকরখানি খাওয়ার বায়না ধরার এটি একটি কারণ। বাকরখানি নামের সাথে পূর্ব পরিচিত ছিলাম। তবে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত খাওয়া তো দূরের কথা দেখা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে বন্ধুর বদৌলতে দর্শন ও ভক্ষণ উভয়ই হলো। বন্ধুর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি পুরনো ঢাকায়। বনেদী পরিবার। মুঘল আমল থেকেই এখানে বাস করে আসছে। বাড়ির কাঠামো দেখলেই বুঝা যায় বেশ পুরনো। এখনো পর্যন্ত সবাই একসাথে যৌথ পরিবারে বাস করে। কম করে হলেও বাড়ির সদস্য-সদস্যা পঞ্চাশ জন।

একদিন বন্ধুর সাথে আত্মীয়ের বাড়ি যাই। রাস্তায় সেকি যানজট! দুই ঘন্টা পথে ব্যয় করে ঘেমে একাকার হয়ে অবশেষে পৌঁছাই। আপ্যায়নের বহর দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ! এত খানাপিনা এক সাথে আগে কখনো খাইনি। তাও আবার বিকালের নাস্তার সময়। মনটা ভালো হয়ে গেল মুহূর্তেই।

পরিবেশনের আগে পাচক এসে বললো, আজ নাকি বিকালের নাস্তাটা তেমন একটা জম্পেশ হয়নি।

শুনে আমি তো অবাক বনে গেলাম! এ পাচক বলে কি! বিকালের নাস্তার যদি এই দশা হয় তাহলে দুপুরের খাবার তবে কেমন হবে! ভাবতেই আমার সরল অঙ্ক গরল হয়ে গেল।

যাই হোক- বেশী খেতে পারিনি। অভ্যস্ত নই তো। তবে বাকরখানির সাথে পরিচয় সেই দিন প্রথম। সবশেষে বাকরখানির বাটি এনে সামনের টেবিলে রাখা হলো। সাথে দামি কাপে দুধ চা। শুনেছি বাকরখানি নাকি দুধ চায়ের সাথে খেতে বেশ লাগে। এমন দামি কাপে চায়ে চুমুক দিতেই নিজেকে মুঘল আমলের রাজ্যহারা সম্রাট মনে হলো। তৃপ্তি পেলাম বেশ!

এ যে বাকরখানি বুঝতে পারিনি।

ভেবেছিলাম বিস্কুট। পাচক এসে বললো, নিন নিন বাকরখানি খান। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভালো লাগবে না খেতে। প্রথমে পাচকের কথা বুঝতে পারিনি। এ যে বাকরখানি পাচকের মুখে জানতে পেরে এক নিমিষে তাকিয়ে রইলাম। বাকর ও খানি বেগমের এই অমর সৃষ্টি থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। বাকর ও খানি বেগমের ভালবাসার সৃষ্টিকে কেন জানি আমার খেতে ইচ্ছে করলো না।

বন্ধুর ডাকে স্বম্বিৎ ফিরে পেলাম। দেখি বন্ধু গোগ্রাসে বাকরখানি গেলায় ব্যস্ত। পাশে দাঁড়িয়ে পাচক মুচকি হাসছে। অগত্যা কি আর করা! বাকরখানি হাতে নিলাম। বাকরখানির গরম ভাবটা হাতে লাগলো। মিষ্টি একটা গন্ধ বেরিয়ে এলো বাকরখানির গা বেয়ে। আলতো মুখে তুলে নিলাম। সামনের পাটির দাঁত দিয়ে কামড় দিতেই ঘটলো বিপত্তি!

জানা ছিলো না বাকরখানি তুরুপের তাসের মতো ভেঙ্গে পড়তে পারে। কামড় দিতে সিকি ভাগও মুখে প্রবেশ করলো না; বাকি অংশ পড়লো সামনে রাখা চায়ের কাপে। সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড! চা গড়িয়ে পড়লো টেবিলে। টেবিল থেকে আমার শার্ট-প্যান্টে মাখামাখি অবস্থা।

সেটা বড় কথা নয়। বরং সে সময় ঘটে যাওয়া ঘটনাই আমার মনে অন্য এক অনুভূতির জন্ম দিয়েছিলো; সেটাকে অবহেলা করা অপাংক্তেয়। বাকরখানি ও চায়ের ভূপাতিত হওয়ার মুহূর্তে রিনিঝিনি হাসিতে ভরে গেলো সারা ঘর।

বাকরখানি, চা না নিজেকে সামলাবো সে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হাসির উৎস নিজে এসেই উপস্থিত। টেবিল থেকে বাকরখানির একটি টুকরো মুখে তুলে চায়ের কাপে হালকা চুমুক দিয়ে বললো, বাকরখানি এভাবে খেতে হয়।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলাম! কোন অষ্টাদশী এত সুন্দর হতে পারে এই প্রথম দেখলাম। মুখের হাসি ও হাতের চুড়ির শব্দ মিশে একাকার। এক পশলা হাল্কা মিষ্টি বাতাস এসে ঘরটাকে ভরে দিয়েছে।

লজ্জা ভুলে তখনো অষ্টাদশীকে দেখছি। অষ্টাদশী নীরবতা ভেঙ্গে বললো, কখন এলে উৎপল দা?

আমার বন্ধুর নাম উৎপল; উত্তর দিলো, এই তো ঘন্টা খানেক হবে। তুমি কেমন আছ সুপ্রিয়া?

বুঝতে পারলাম অষ্টাদশীর নাম সুপ্রিয়া। আমার মনে হলো- সুপ্রিয়া আমার দিকে তাকিয়ে সাদা দাঁতগুলো বের করে আবারও এক ঝাঁক হাসি ছড়িয়ে বললো, ভালো নেই উৎপল দা! মাথা ব্যাথাটা আবার বেড়েছে।

সুপ্রিয়া যেভাবে হঠাৎ এসেছিলো ঠিক একইভাবে হঠাৎই চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মিষ্টি গন্ধটা আবারো নাকে এসে লাগলো। অনুধাবন করতে চেষ্টা করলাম কি পারফিউম মেখেছে। কিন্তু কোন ভাবেই বুঝতে পারলাম না। দেশের

বাইরেরই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

সুপ্রিয়া চলে যাওয়ার পর একে একে আরো অনেকে এলো। কথা হলো। মন বারে বারে চাচ্ছিলো, সুপ্রিয়া আবার ওর রূপ ছড়িয়ে আসুক। কিন্তু সেদিন আর দেখা হয়নি। যেদিন দেখা হয়েছে সেদিন ও আর পৃথিবীতে নেই।

সকালে খবরটা পাই। উৎপল মোবাইলে জানালো। সুপ্রিয়া গতরাত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে। দুপুরবেলা উৎপল আর আমি পুরানো ঢাকায় যাই। বাড়িভর্তি মানুষ। কোন প্রকার ময়নাতদন্ত হয়নি। সুপ্রিয়ার বড় চাচা র‍্যাবের লোক হওয়াই খুব সহজেই সব কিছু ম্যানেজ করা গিয়েছে। সুপ্রিয়ার লাশটা বাইরের বারান্দায় রাখা। উৎপল আর আমি লাশের কাছে যাই। সুপ্রিয়ার চোখ বন্ধ। মনে হলো এখনই সেই প্রথম দিন দেখা হাসি ছড়িয়ে বলবে, বাকরখানি এভাবে খেতে হয়।

আমার খুব কান্না পাচ্ছিলো। চোখ থেকে যে কোন সময় জল গড়িয়ে পড়তে পারে। লাশের কাছ থেকে সরে এলাম। ঐ দিন ফিরে আসার সময় উৎপল জানালো, সুপ্রিয়ার ঘর থেকে সুপ্রিয়ার লেখা একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছে। চিঠিতে লেখা- মাথা ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছি।

এরপর প্রায় পাঁচ বছর আর পুরনো ঢাকামুখী হইনি। কোন প্রয়োজন পড়েনি। সুপ্রিয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সুপ্রিয়া বেঁচে থাকলে হয়তোবা যাওয়া হতো।

লুসিয়াকে বাকরখানি খাওয়াবো বলতেই সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়লো। দিনক্ষণ ঠিকই ছিলো। ছুটির দিন। রাস্তায় যানযট নেই বললেই চলে। লুসিয়াকে আগেই জাদুঘরের সামনে দাঁড়াতে বলেছিলাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। উৎপল ওর স্ত্রীকে নিয়ে যাবে বলেছিলো। কিন্তু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়াতে আসতে পারেনি।

রিকশা চলছে পুরনো ঢাকা বরাবর। পুরনো ঢাকা এখনো পুরনো ধাঁচেরই। রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত। নতুন বহুতল ভবন উঠছে তবে পুরনো বিল্ডিংগুলোর গৌরব এখনো অমলিন। লুসিয়ার এই প্রথম পুরনো ঢাকায় আসা। লুসিয়ার হাত ধরে বসে আছি। মনে হচ্ছে ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছি ইতিহাসের কৃষ্ণগহ্বরে। লুসিয়া আমার একমাত্র সঙ্গী। ইতিহাসগুলো সাদাকালোয় ভরপুর। সেখানে আমি আর লুসিয়া রঙ্গিন আলোয় আলোকিত।

রিকশাওয়ালাকে বলা আছে বাকরখানির দোকান দেখে দাঁড়াতে। রিকশা দাঁড়ালো। সামনে বাকরখানির দোকান। ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ি। দোকানে ঢুকলাম। ফাঁকা টেবিল দেখে বসি। বাকরখানি ভাজা হচ্ছে। লুসিয়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বাকরখানি দেখে। জীবনের প্রথম বাকরখানি খাবে লুসিয়া। অর্ডার করলাম। সাথে দুধ-চা।

হোটেল বয়টার বয়স বড়জোর দশ-বারো হবে। দুটি কাঁচের গ্লাসে ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গেল। ঢকঢক শব্দে দুই গ্লাসের সম্পূর্ণটাই সাবাড় করে দিলাম। লুসিয়া আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

বুঝতে পারলাম ও খুশি হয়নি।

হোটেলবয়কে ডেকে আবারো ঠাণ্ডা পানি দিতে বললাম। একটু পরেই পানির সাথে গরম গরম বাকরখানি ও দুধ চা নিয়ে এসে হাজির। লুসিয়ার আগ্রহভরে খাওয়া দেখে বেশ ভালো লাগলো। দেখে আমার মধ্যে কেমন জানি একটা তৃপ্তির পূর্ণতা এসেছে।

নিজে খেতেই ভুলে গিয়েছিলাম। বাকরখানি চায়ে ভিজিয়ে যেই না খেতে যাবো বাকরখানি ভেঙ্গে গেল। হাতে রইলো ছোট এক টুকরো। চায়ের গ্লাস গেল উল্টে। একটুর জন্য চা লুসিয়ার কাপড়ে পড়েনি।

আর সেই মুহূর্তে ঘটে গেল সেই ঘটনা। স্পষ্ট আমার কানের কাছে শুনতে পেলাম সুপ্রিয়ার কণ্ঠ, বাকরখানি এভাবে খেতে হয়!

এ প্রশ্নের উত্তর কি হবে আমার জানা নেই। মনে পড়লো পুরনো ঢাকায় সুপ্রিয়ার সাথে দেখা হওয়ার দিন ওর প্রথম কথা তো এটাই ছিলো। চারিদিকে তাকালাম। হোটেলে লোকজন কম। লুসিয়া আপনমনে চায়ে ভিজিয়ে বাকরখানি খাচ্ছে।

হোটেলের জানালা খোলা। দক্ষিণ দিক থেকে জানালা ভেদ করে বাতাসে মিশে সুপ্রিয়ার ব্যবহৃত সেদিনের পারফিউমের গন্ধ এসে নাকে লাগলো স্পষ্ট। আমার কোন ভুল হয়নি। ছোটবেলা থেকেই যে কোন গন্ধ একবার পেলে সহজে ভুলে যাই না। এ রকম গন্ধ আমি একবারই মাত্র পেয়েছিলাম। আর আজ দ্বিতীয়বার। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে পাশের দু'তালা বাড়ির জানালার দিকে তাকাতেই অবিকল সুপ্রিয়ার মুখটা দেখতে পেলাম। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশে চোখ পড়তেই মুখটা সরে গেল।

এরপর আমার আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি নিজ ঘরে বিছানায়। মাথার পাশে লুসিয়া বসে। লুসিয়ার দিকে তাকাতেই বললো, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! শুনে কোন উত্তর দিইনি।

ঘরের টেবিলের দিকে চোখ পড়তেই দেখি বাটিভর্তি বাকরখানি। মনে হলো- জানালার পাশে সুপ্রিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরিচিত গন্ধটা ভুরভুর করে ঘরে ঢুকছে। সুপ্রিয়া এখনই ঘরে এসে বলবে, বাকরখানি এভাবে খেতে হয়।

বিছানা ছেড়ে বাইরে যাবো। লুসিয়া হাতটা টেনে ধরে বললো, কোথায় যাচ্ছ! আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলো। মনে হলো- লুসিয়া সত্য; আর অন্য সবই কল্পনা-মিথ্যা-মরীচিকা॥

লোকে বলে ছোটলোক!

মার্সেল কান্টা

লোকে বলে ছোটলোক ছোট নয় মন,
ছোট বুকে ছুঁয়ে যায় প্রভুর চরণ।
আমি ছোট বালুকণা দুরন্ত সাগরে,
গর্জন থেমে যায় ছোট বুকের পাঁজরে।
নহে আমি নির্ঝর ছলছল সিন্ধু,
আমি ধূ-ধূ মরুতে শিশিরের বিন্দু!
অসহায় তাই নেই মনে বড় হা-হুতাশ,
বহমান সুখ দুঃখ পাবনের উচ্ছ্বাস।।

আমি দীন মেঠোপথ অধম অসার,
বুকে রাখি পদরেখা স্মৃতি মণিহার।
তৃণলতা হয়ে থাকি স্নেহকণা বিজয়ে--
নীচকুলে জাত বলে স্থান নেই হৃদয়ে!
আমি ধ্রুবতারা নহিগো পথহারা
পথিকের,
জগতের দীপালি মিটিমিটি ক্ষণিকের।
প্রান্তরে বাঁশী এক বাজি দিবা রজনী,
চিরচেনা সুর তবু বিরহিত সজনী!
ভালোবাসা দূরাশা সাধ জাগে বাসিতে
আমি হেন বনফুল ঝরে পড়ি মাটিতে॥

পরাণের গহীনে

মিতালী মারিয়া কস্তা

'এই মেয়ে তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও?' সোজা হয়ে বসেও প্রায় ঘুমিয়ে যাচ্ছিল অথৈ, সিস্টারের প্রশ্ন শুনে কিছুটা চমকে উঠলেও জড়ানো কণ্ঠে তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়, সিস্টার। কারণ সেই সময় এই প্রশ্নের উত্তরে এই উত্তরটাই সবার জন্য স্বাভাবিক ছিল। শুধুমাত্র দু'একজন সাহসী এবং ইচ্‌রেপাকা মেয়ে যারা নাকি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করত, তারা বলত, নার্স হব। সেদিন তার ঘুম জড়ানো উচ্চারণের কারণেই বোধহয় সিস্টার শব্দটাকে তার ক্লাসে পাঠদানরত সিস্টার শুনেছিলেন, টিচার। তাই তিনি কিছুটা উপহাসের সুরে বলেছিলেন, ওহ্ টিচার হতে চাও, প্রাইমারী-টিচার। ক্লাসের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, সবাই বুঝেছ, অথৈ বড় হয়ে প্রাইমারী স্কুলের টিচার হতে চায়। এই বলার মধ্যে ছিল ব্যঙ্গ। ক্লাসের সকল মেয়ে অকারণেই হেসে উঠেছিল। পুরো ক্লাসের মধ্যে অথৈ জড়সড় হয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিল। অথৈয়ের মনের সেই কষ্ট যা তার চোখে-মুখে ভেসে উঠেছিল, সে দিকে কেউ সেদিন নজর দেয়নি। মনে মনে শুধু বলেছিল- না আমি টিচার বলিনি, সিস্টার বলেছি। যেন সিস্টার না হওয়াটা বড় কোন একটা অপরাধ। অষ্টম শ্রেণিতে পড়া টিনএজ সেই মেয়েটি জানতই না নিজের জীবনের স্বপ্ন কিভাবে নিজেকেই বুনতে হয়। তখনকার সময়ে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মানো মেয়েদের বাবা মা'দের একমাত্র স্বপ্ন ছিল, মোটামুটি একটা ভাল ঘর দেখে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। যাদের ভাগ্য ভাল ছিল তারা মেট্রিকের পরও পড়ার সুযোগ পেত। একটা বড় সংখ্যক মেয়ের কপালে মেট্রিকের পর আর লেখাপড়ার সুযোগ হত না। মেট্রিক পর্যন্ত পড়তে পারত সেটাও মিশনারি স্কুল ছিল বলে, তা না হলে আরও অনেকেই হয়ত প্রাইমারীর চৌকাঠও মাড়াতে পারত না। যেই মেয়েদের পড়াশুনারই এই হাল, জীবনে কিছু একটা হওয়ার স্বপ্ন তো তাদের কাছে ছিল অলীকতা। বড় হয়ে কিছু হওয়ার স্বপ্ন দেখতে হয়, নিজের স্বপ্ন নিজেকেই দেখতে হয়, এটা তারা জানতই না। তাই তাদের জীবনের পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করত তাদের বাবা-মায়ের পছন্দ-অপছন্দের উপর।

অষ্টম শ্রেণির সেই অথৈ এখন মধ্যবয়স্ক। কালে-চক্রে শেষ পর্যন্ত সে শিক্ষকই হয়েছে। নিজে স্বপ্ন না দেখলেও পরিবারের বড়দের দায়িত্ববোধের কারণে সে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষ করে এখন শহরের একটা কলেজে শিক্ষকতা করে। পরিবারের বড়রাও তাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখেনি। তবে পড়াতে হবে এটা ছিল তাদের তাড়না, বাকীটা ঘটেছে ঘটনার আপন গতিতে। নানাদিক পর্যালোচনা করলে সে সুখী এবং সফল। এখন সে তার ছাত্রদের স্বপ্ন দেখতে শিখায়। এই বয়সে এসে সে জীবনে আরেকবার অষ্টম শ্রেণির সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, আপনি আসলে জীবনে কি হতে চেয়েছিলেন? আপনার ড্রীম কি ছিল? প্রশ্ন শুনে অথৈয়ের বুকের মধ্যে কেমন একধরনের হাহাকারবোধ তৈরী হল। সত্যিই তো কি হতে চেয়েছিল সে? প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার মন একবার অতীত ঘুরে এল, অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কি হতে চাও বড় হয়ে? আজ আবার সেই একই প্রশ্ন তার অস্তিত্বকে নাড়া দিল। হেসে জবাব দিল, বড় হয়ে কিছু হব এটা তো কোন দিন চিন্তাই করিনি। অথৈয়ের মত স্বপ্ন তৈরি করতে না পারা কত মেধা অপ্রকাশিত রয়ে গেল। অথৈ মাঝে মাঝে ভাবে জীবন মানে কি শুধুই ভালভাবে বেঁচে থাকা? কি ছাপ রেখে যাচ্ছে সে পৃথিবীতে? তার মেধা দ্বারা সৃষ্ট কোন কিছু! অথৈয়ের মত কত মেধাবী বেঁচে থাকে শুধু তুমিতে। পরিবারে অথৈ সুখী। রান্না-বান্না, অতিথি আপ্যায়ন, ঘুরে বেড়ানো, শপিং করা সবকিছুই সে আনন্দ নিয়ে করে। এসব নিয়েই তার সুখ। তাছাড়া তার একমাত্র মেয়ে, সেও ভাল পড়াশুনা করে সেও সঠিকভাবে বড় হচ্ছে। সে কি আসলে এভাবেই সুখী হতে চেয়েছিল? ছোটবেলায় প্রেরণার অভাবে জীবনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করতে পারেনি। বড় হয়েও ছক বাঁধানো চাওয়াগুলো পূরণ হওয়াকেই সুখ ভেবে নিয়েছে। জীবন পরিক্রমার মধ্যাহ্নে এসে সে পর্যালোচনা করে দেখে তার আনন্দটা আসলে তুমিনির্ভর। এই তুমিটা হচ্ছে স্বামী-সন্তান-সংসার। এই আনন্দে তার চাওয়া কতটা পূরণ হয়? হ্যাঁ তারও ভাল লাগে ঘুরে বেড়ানো, কেনাকাটা ইত্যাদি তাই এগুলোকেই সে জীবনের আনন্দ উপকরণ ভেবে নিয়ে সুখী হয়। কিন্তু এখানে তার নিজের ইচ্ছা পূরণ হয় কোথায়? অথৈ এবার ঠিক করে, এখন থেকে তাতেই আমার আনন্দ হবে আমি যা চাই এবং আমার যা ভাল লাগে। এবার সে তার বাকি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করবে। এবং তার সমস্ত মেধা দিয়ে তা পূরণ করবে। ছোটবেলায় যে কষ্টে সে কুঁকড়ে গিয়েছিল সে কষ্টকে সে আনন্দে পরিণত করবে।

শুরু হয় তার নতুন করে আমিতে আনন্দ পাওয়ার প্রয়াশ। সে ঠিক করে, পিএইচডি করবে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে আবেদন করল। এই কাজটা করতে তার খুব ভালো লাগলো। সে দেখলো যে পিএইচডির জন্য আবেদন করতে আলাদা করে বিশেষ কোন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন শুধু একটু ধৈর্য ও সময়। যে সেন্টারের সহযোগিতায় সে আবেদন করছে সেখানে বসে একদিন সে একটা ফর্ম পূরণ করছিল। কাজ করতে করতে সে টের পেল কেউ একজন তার উল্টাদিকে এসে বসেছে। হাতের কাজ শেষ করে সে মুখ তুলে সামনে বসা লোকটিকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, তুমি! হ্যাঁ, আমি, হাসিমুখে উত্তর দিলো সামনে বসা লোকটি। তোমায় দেখেই এখানে এসে বসলাম, কি পিএইচডির জন্য আবেদন করছো? অথৈয়ের পাল্টা প্রশ্ন, তুমি কিভাবে বুঝলে? একই ফর্ম আমিও পূরণ করছি তো তাই বুঝলাম, লোকটি বলল। এই লোকটি হচ্ছে নিলয়, ছাত্রজীবনে অথৈয়ের বন্ধু, কাছের মানুষ, প্রেমিক, সবকিছু। ওরা দুজন একই বিদ্যাপিঠে, একই সাবজেক্টে পড়ত। নিলয় ছিল দু'বছরের সিনিয়র। ডিপার্টমেন্টে প্রথমদিন অথৈ কিছুটা দিশেহারা হয়ে ২০৫ নম্বর রুম খুঁজছিল। হঠাৎ সামনে নিলয় এসে জিজ্ঞেস করে, কত নম্বর রুম? অথৈ বললো, ২০৫। নিলয় তাকে ২০৫ নম্বর রুমে পৌঁছে দিল। থ্যাঙ্ক ইউ, বলেই অথৈ ক্লাসে ঢুকে গেল। ৫৫ মিনিটের ক্লাস শেষ করে বের হয়ে দেখে ছেলেটি তখনও ২০৫ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়ানো। অথৈ বের হতেই বললো, আর কোন ক্লাস চিনিয়ে দিতে হবে? অথৈ হেসে ফেলে বলল, না, এখন সব খুঁজে বের করতে পারব, আমার বান্ধবীকে পেয়ে গেছি। আপনি কি এতক্ষণ এখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিলয় চোখ নাচিয়ে অবলীলায় মিথ্যা বলে দিল, হ্যাঁ। আসলে নিলয় দাঁড়িয়ে থাকেনি, সে ক্লাস শেষ হওয়ার ঠিক পাঁচ মিনিট

আগে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই মেয়েকে দেখে তার জীবনে প্রথমবার মনে হয়েছে, আমি একে জনম জনম ধরে চিনি। এ মেয়ে হচ্ছে তার জীবনে সাত সাগর আর তের নদীর ওপার থেকে ধেয়ে আসা ঢেউ যা তার বুকে আছড়ে পড়ছে। সেদিনের পর থেকে নিলয় তার পিছু ছাড়েনি। ছাত্রজীবনের সেই দিনগুলি ছিল উত্তাল, উদ্দাম, লাগামহীন ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। নিলয় অথৈ থেকে দু'বছর আগে পাশ করে বের হল। ভালো রেজাল্টের কারণে খুব সহজেই সে ঢাকার বাইরে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিয়োগ পেল। নতুন জায়গা, নতুন চাকুরি, নতুন পরিবেশ - মানিয়ে নিতে নিলয়ের কিছুটা সময় লেগে গেলো। এতদিন ছাত্র ছিলো, এখন শিক্ষক হয়েছে। দক্ষতার সাথে পড়ানোর কৌশল রপ্ত করতে সিনিয়রদের সাথে সময় কাটাতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে অথৈয়ের সাথে ঠিকঠাকমত যোগাযোগ করা হয়ে উঠেনি। বাসায় কখনো অথৈকে ফোন করা যায় না। এ ব্যাপারে অথৈয়ের কঠিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে। আর ছুটির দিনে খুব জরুরি কোন কাজ না থাকলে অথৈ ঘর থেকে বের হয় না, কারণ তার মা অসুস্থ। তার মেট্রিকের পর পরই তার মা অসুস্থ হয়ে পরে। মা হাঁটতে পারে না আবার মানসিকভাবেও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। এইজন্য ছুটিরদিন সে একান্তভাবে মায়ের সাথে কাটায়। মাকে স্নান করানো, খাওয়ানো এসব কাজগুলো ছুটিরদিনে নিজেই করে। তাই নিলয় ছুটির দিনে চাইলেও অথৈয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারে না। টানা দু'সপ্তাহ ওদের কোনপ্রকার যোগাযোগ হয়নি। কারণ তখন মোবাইল সবার জন্য এত সহজলভ্য ছিল না। দু'সপ্তাহ পর নিলয় একদিন সরাসরি ডিপার্টমেন্টে চলে আসে।

নিলয়কে দেখে অথৈ উচ্ছ্বল হয় বটে কিন্তু অভিমানে ঠোঁটও ফুলায়। এটুকু সময়ের মধ্যেই নিলয়কে কেমন পরিনত, বিচক্ষণ মনে হয়। অকপটে অভিমানির অভিমান ভাঙ্গায়। তারপর দু'জন একটা অদ্ভূত চুক্তি করে। তারা তাদের ভালোবাসায় অটুট বিশ্বাসী। তাই এমন অদ্ভুত চুক্তি করতে একটুও দ্বিধা করেনি। তাদের চুক্তিটি ছিল তারা ফোন করবে না যদিও দু'জনেরই ল্যান্ডফোনে কথা বলার সুযোগ ছিল। প্রতিমাসে একবার করে নিলয় একদিনের জন্য ছুটি নিয়ে আসবে। সেদিন তারা সারাদিন গল্প করে কাটাবে। যতই মন খারাপ হোক, তারা ফোন করবে না। বোকা ছেলেমেয়ে দু'টি তখন একবারও ভাবেনি, এই একমাসে নায়াগ্রায় কত ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন গ্যালন পানি বয়ে যেতে পারে! পরের মাসে কাঙ্খিত দিনটির আগেই নিলয়ের বাড়ি থেকে তার বাবার অসুস্থতার খবর আসে। ছুটে যায় নিলয় বাবাকে দেখতে। যাওয়ার পথে বাস দুর্ঘটনার কবলে পরে সে। টানা একসপ্তাহ চলে জমে-মানুষে লড়াই। যমদূত শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হার মানে। একসপ্তাহ পর চোখ খুলে নিলয়। হাসপাতালে থাকতে হয় আরো দশদিন। দশদিন পর বাড়িতে যায়। সেখানে গিয়ে পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার জন্য আরো পনেরদিন থাকে মায়ের নিবিড় পরিচর্যায়। তারপর কর্মস্থলে ফেরার আগে সে যায় অথৈয়ের সাথে দেখা করতে। এরমধ্যে দুইমাস গত হলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ডিপার্টমেন্টে গিয়ে অস্থিরভাবে সে অথৈকে খুঁজে না পেয়ে অথৈয়ের একজন ক্লাসমেটকে জিজ্ঞেস করে অথৈয়ের কথা। তখন সেই মেয়েটি জানালো যে অথৈয়ের আজ বিয়ে। মেয়েটি আরো কিছু বলছিল কিন্তু নিলয়ের কানে কিছু ঢুকেনি। তার সামনে সময় থমকে যায়। স্তব্ধ হয়ে যায় সে। কতক্ষণ! অনন্তকাল! হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে ওঠে পরে গিয়ে জ্ঞান হারায়। যখন জ্ঞান ফেরে তখন আবারও সে নিজেকে আবিষ্কার করে হাসপাতালের বিছানায়। এতবড় দুর্ঘটনার পর তার শরীর এবং মন এই দুঃসংবাদটি নিতে পারেনি। সেবার একদিন পরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা চলে আসে তার কর্মস্থলে। এরপর আর যোগাযোগ হয়নি ওদের। অথৈয়ের মা'র শরীর ক্রমশ অবনতি হচ্ছিল। তাই মা বেঁচে থাকতে তার বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে চাইলেন। পাত্রও পছন্দ করা ছিল। অথৈ যখন এ বিষয় জানতে পারল সে বাবার কাছে কিছুটা সময় চাইল। বাবাও বলল, ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল রেখো তোমার মায়ের শরীর কিন্তু খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। আমি এ ব্যাপারে ভালো বোধ করছি না। অথৈ শর্ত ভেঙ্গে পাগলের মত নিলয়কে ফোন করে গেছে, কিন্তু কেউ ফোন রিসিভ করেনি। দিশেহারা অথৈ কেঁদে বুক ভাসিয়েছে কিন্তু কিচ্ছু করতে পারেনি। বিয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে অপেক্ষা করেছে। অবশেষে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

আজ এতবছর পর আবার তাদের এভাবে দেখা! দু'জনই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে। আজও নিলয়ের বুকে সেই সাত সমুদ্র তের নদী পাড় হওয়া ঢেউ আছড়ে পড়ে। অথৈয়ের আজন্ম সংস্কার তাকে আবেগ দমনে সহায়তা করে। ভিতরের উচ্ছ্বলতা ভিতরেই চেপে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তার চোখেমুখে আনন্দটুকু ফুটে ওঠে। সেদিন কথা হয় দীর্ঘ সময়। সময়ের আবর্তে দু'জনই বাস্তবতা মেনে নিয়ে সংসার করছে। যার যার অবস্থানে ভালো আছে। কিন্তু ভালোবাসার বিচ্ছেদের যন্ত্রণা দু'জনের বুকের মধ্যেই খোঁচা দেয়। পরাণের গহীনে একজন আরেকজনকে ধারণ করে আছে অতি সঙ্গোপনে। সরব সংসারে এই ধারণ একেবারেই নিরব ছিল এতদিন। আজ আবার পরাণের গহীন থেকে যখনই বেরিয়ে আসার জন্য পথ খুঁজছে ঠিক তখন বাস্তবতা এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। নিলয় বললো, চলো দু'জন একইসাথে একই ভার্সিটি থেকে পিএইচডি করি। একসাথে পিএইচডি করার সময়টা একটা ফিল্মের রিলের মত একমুহূর্তে অথৈয়ের মনে ঘুরে এল। মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। মন ছুটে চলে গেল ছাত্রজীবনের সেই দিনগুলিতে। আবার সেই দিন, সেইসময়! জীবনের সব কষ্ট, না পাওয়ার ব্যাথা এবার পুষিয়ে নিবে। মনে যখন ভালোলাগার টর্নেডো বয়ে যাচ্ছে ঠিক তখনই মেয়ে ফোন দিলো, মা কখন আসবে? প্রজ্জ্বলিত আনন্দের আগুনে যেন কেউ পানি ঢেলে দিলো। চুপসে গেল অথৈ। সাথে সাথে সংসার নামক বাস্তবতা যেন সাহস ফিরে পেলো। পরানের গহীনে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসাকে আর বের হতে দিল না বরং আরো কঠিন, শক্ত একটা অর্গল লাগিয়ে দিল। অথৈয়ের মুখের রঙ পাল্টে যেতে দেখে নিলয় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো, অথৈ? তুমি আমাকে দেখে খুশি হওনি? তুমি চাওনা আমরা একসাথে পিএইচডি করি? অথৈ ম্লান কণ্ঠে বললো, নাহ্ আমি এখন পিএইচডি করবোনা। দেখি পরে কখনো করতে পারি কিনা। এখন মেয়েকে একটু বেশি সময় দিতে হয়। তাহলে ফোন নম্বরটা দাও, নিলয় বললো। অথৈ জবাব দিলো, আবার যদি কখনো দেখা হয় তাহলে দিবো। আমারটাও নিবে না, নিলয় জানতে চায়? নাহ, অথৈয়ের মৃদু উত্তর। বেরিয়ে আসতে চাওয়া কান্নাটাকে জোর করে আটকানো হচ্ছে বলে গলার কাছটাতে এসে সে দুমরেমুচরে গিয়ে একটা অস্বস্তি তৈরি করছে। এই অস্বস্তিটাকে লুকাতে পারলেও চোখের কোনে বেরিয়ে আসা পানিটুকু ঠিকই চিকচিক করছে। নিলয়ের সাহস হলো না সেই পানি মুছে দিতে। বিদায় নিয়ে অথৈ চলে যাচ্ছে। একবারের জন্যও পিছনে ফিরে তাকালো না। নিলয়ের পাঁজর ভেদ করে দীর্ঘশ্বাস বেড়িয়ে এলো - আর কি কোনদিন তার বুকে সেই সাত সমুদ্র তের নদী পাড় হওয়া ঢেউ আছড়ে পড়বে?

কোভিড নাইনটিন

যোসেফ শরৎ গমেজ

অনেক রাতে হঠাৎ ডেভিডের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। মাথার কাছে ছোট্ট টেবিলের উপর রাখা মোবাইলটি হাতে নিয়ে হ্যালো বলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে একটা মেয়ে বলে ওঠে, আংকেল আমি রহীনি। কি হয়েছে মা এত রাতে ফোন করেছ কেন? রহিনী জবাব দেয়, আংকেল বাবা হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছে বাবার করোনা হয়েছে। কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে? ডেভিড জানতে চায়। রহিনী বলল, ইমপেরিয়াল হাসপাতাল, ফয়েজ লেক পাহাড়তলী। তুমি দুঃচিন্তা করোনা, তোমার বাবা ভাল হয়ে যাবে। বিশালের করোনা টিকা দেওয়া আছে। কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, বাবার তো হার্টের সমস্যা আছে। ডেভিড বলে, বিশালের কিচ্ছু হবেনা। তুমি চিন্তা করোনা আমি আসছি।

বিশাল, ডেভিড আর অভিজিত এরা খুব কাছের বন্ধু। বিশালের বাড়ি শুলপুর গ্রামে। বান্দুরা হলি ক্রশ হাই স্কুল থেকে ডেভিড আর বিশাল এক সঙ্গে এসএসসি পাশ করেছিল। তারপর বিশাল জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয় আর ডেভিড ঢাকা নটর ডেম কলেজে। অভিজিত শিকারীপাড়া হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে, পরে শিকারীপাড়া হাইস্কুল কলেজ হওয়ায় অভিজিত ওখান থেকেই বিএ পাশ করে শিকারীপাড়া হাই স্কুলেই শিক্ষকতা করে, পরে বিএডও পাশ করে। দীর্ঘ সময় পার হলেও ওদের বন্ধুত্ব অটুট আছে।

পরদিন সকালে ডেভিড অভিজিতকে ফোন করে বিশালের খবরটা জানায়। অভিজিত সঙ্গে সঙ্গে বলে, তাহলে তো বিশালকে দেখতে যাওয়া দরকার। ডেভিড বলল, চল আমরা চট্টগ্রাম যাই। অনেকদিন বিশালের সাথে দেখা হয়নি। এখন আমাদের তো বয়স হয়েছে ওর সাথে দেখা হলে আমাদেরও ভাল লাগবে বিশালেরও ভাল লাগবে। আমরা তো ভ্যাকসিন নিয়েছি, আমাদের অতটা ভয় নেই।

চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য অভিজিত পরদিন ঢাকায় যায়। ট্রেনে যাবে না বাসে যাবে এই নিয়ে দু'বন্ধু ফোনেই সিদ্ধান্ত নেয়। বাসে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে আবার আরামেও যাওয়া যাবে। প্রায় দু'বছর যাবৎ স্পেশাল বাস চালু হয়েছে। অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস ভোর ছয়টায় ছাড়ে। অগত্যা বাসে যাওয়াই ঠিক হলো। অভিজিত সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ ঢাকায় ফার্মগেইট ডেভিডের বাসায় পৌঁছে যায়।

অভিজিতকে পেয়ে ডেভিড মনে মনে খুব খুশী হয় কিন্তু মুখে বলে হয়তো চট্টগ্রাম যাওয়া হবে না। অভিজিত বলে কেন? ডেভিড বলে, করোনায় দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে ওঠেছে। সামনে ঈদ খুব সম্ভব আগামী কাল থেকে সারাদেশে লক-ডাউন দিতে পারে। রাত দশটার খবরে কনফার্ম জানা যাবে।

শেষ পর্যন্ত লক ডাউনের কারণে ডেভিড আর অভিজিতের চট্টগ্রাম যাওয়া হলোনা। ডেভিডের বাসায় রাতে খাবার পর দু' বন্ধুতে গভীর রাত পর্যন্ত গল্প করে সময় পার করে। দু'জনের বয়সই ষাটের কোঠায়। জীবনের অনেক পথ এরা পেরিয়ে এসেছে। বিশাল, ডেভিড আর অভিজিত প্রায় সমবয়সী। ওদের মধ্যে বিশালই আগে বিয়ে করেছিল। অভিজিত বলে, "তোমার কি মনে আছে বিশালের বিয়ের কথা?" ডেভিড বলে মনে নেই আবার; বিয়ের একদিন আগে শুলপুর গেলাম তুমি আর আমি আর ফিরলাম বিয়ের তিনদিন পর। বিশাল কি আমাদের আসতে দিল? আমার নতুন চাকুরী তাও যায় যায়, অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি। বন্ধুর বিয়ে বলে কথা। চাকুরী গেলে চাকুরী পাবো। বন্ধু হারালে বন্ধু পাবো না। তখন ছিল আমাদের যৌবনের প্রথম সকাল। দুর্বার গতিতে ছুটে বেরিয়েছি। তোমার মনে আছেতো? বিশালের বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ীতে জম-জমাট নাচ গানের আসর বসেছিল। উঠান ভরে উঠেছিল লোকজনে। বিশালের শ্বশুরবাড়ী ছিল মজিদপুর গ্রামে। শুলপুর আর মজিদপুর পাশাপাশি গ্রাম মাঝখানে ছোট্ট একটা নদী। এটাকে খালও বলা চলে। গির্জার পাশে নদীর উপর একটা বাঁশের পুল ছিল নদী পারাপারের জন্য। উঠানে লোকজন দেখে মনে হয়েছিল দুই গ্রামের সব মানুষই আসরে উপস্থিত। মাঘ মাস প্রচণ্ড শীত। পরদিন সেই প্রচণ্ড শীতের সকালে খেজুরের রস খেয়ে বরের সাথে গির্জা গিয়েছিলাম বিয়ের অনুষ্ঠানে। সে কথা কি ভুলতে পারি? অভিজিত বললো, আসলেই সেই সব স্মৃতিময় সোনালী দিনগুলো এখনও হৃদয়ের গভীরে জ্বলজ্বল করছে। জানো ডেভিড, আমি যখন একা একা থাকি তখন ভাবি জীবনটা কত সহজে ফুরিয়ে এলো। ডেভিড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, আরে ভাই জীবনটা এরকমই সুখের দিনগুলি খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। যে দিন যায় সে দিন আর আগের মত ফিরে আসে না।

অভিজিত বলে, তাহলে তুমি ফোন করে রহিনীর সাথে কথা বলে জেনে নিও, বিশাল কেমন আছে। আর লক ডাউন ওঠে গেলে বা শিথিল হলে আমরা বিশালকে দেখতে যাবো। ডেভিড বলল, আমি কাল সকালেই ফোন করে কথা বলবো রহিনীর সাথে। অভিজিত বলল, আমি তাহলে সকালের গাড়ীতেই গ্রামের বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই। বাড়ীতে ফিরে যাবার কথা শুনে ডেভিড বলে ওঠে, সেকি, তুমি চলে যাবে মানে! তোমার আসার কথা শুনে সন্ধ্যা কতকিছু আয়োজন করেছে, তুমি জানো? কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে। আমাদের হাইস্কুলে আগামী মাসের ১০ তারিখে একজন মন্ত্রী আসছেন। তাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে এবং তার সব দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আমারও একটা দায়িত্ব আছে। পাশের ঘর থেকে একটা ট্রে হাতে করে আসতে আসতে সন্ধ্যা বলল, দায়িত্ব থাকলেই সবসময় সব দায়িত্ব পালন করা যায়না অভিজিতদা। এতদিন পরে এলে তোমাকে এমনিই ছেড়ে দেব? হাতের ট্রে থেকে দইয়ের কাপগুলো টেবিলের উপর নামিয়ে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে সন্ধ্যা। তারপর দইয়ের কাপগুলো প্রথমে এক কাপ অভিজিতকে অন্য কাপ ডেভিডকে দিয়ে নিজে একটা কাপ নেয়। দইয়ের কাপ হাতে নিয়ে অভিজিত বলে, রাতের বেলা দই খাবো? একেবারে নিজের হাতে ঘরে পাতা দই, নির্ভেজাল। সন্ধ্যা একটু গর্ব করেই কথাটা বলল। ডেভিড বলল, আজকাল বাজারে বড় বড় মিষ্টির দোকানে যেসব দই পাওয়া যায় তা খেতে ভয়ই করে। সন্ধ্যা বলে, জানো অভিজিত দা আমি ভেবেছিলাম তোমাদের সাথে আমিও চট্টগ্রাম যাব বিশাল দাদাকে দেখতে, বহু বছর দেখা হয়নি। ডেভিডও বলল, বিয়ের পর বিশাল সেই যে নতুন চাকুরীতে চট্টগ্রাম গেল আর আসেনি। মাঝখানে একবার দেখা হয়েছিল সেও অনেক বছর আগে। ডেভিড আরও বলল, বিশাল চট্টগ্রাম কাষ্টমস্ এ চাকুরী পেয়েছিল। খুব ভাল চাকুরী, প্রমোশন পেয়ে পেয়ে অনেক উপরে ওঠেছিল। বাড়ি-গাড়ি সব কিছুই পেয়েছিল। লিলিকে সাথে নিয়ে যাবার পর আর আমার সাথে দেখা হয়নি। শুধু ফোনে কথা হতো। লিলি একদিন বলেছিল, ডেভিডদা তোমাদের এলাকায় একবার যাবো। তোমাদের এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এর

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন
সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়

৮১ পথ চলার গৌরবময় বছর

পরও ওরা আসেনি। আমি চাকুরী নিয়ে বারমুদা যাই। এক সফর দিয়ে এসে বিয়ে করি। আমার বিয়েতেও ওরা ছিলনা, শুধু চাকুরীর জন্য। অভিজিত বলল, তুমিতো আমাদের বিয়েতেও ছিলেনা। ডেভিড বলল, হ্যাঁ ঐ একটাই কারণ। তাছাড়া বিদেশে চাকুরীতে যখন তখন ছুটিতে আসা যায়না। বিশালের সাথে আমার ফোনেই আলাপ হতো বেশী। মাঝে মাঝে বলতো আমার কাজের চেয়ে আমার দায়িত্বই বেশী। বিশালের প্রথম সন্তান মেয়ে রহিনীর জন্মের পর বিশাল এত খুশী হয়েছিল ফোনে আমার সাথে এক ঘন্টার বেশী সময় কথা বলেছে। ঠিক তার এক বছর পর হঠাৎ একদিন বিশাল আমাদের ফোন করে ভয়ানক একটা দুঃসংবাদ দিয়েছিল, তা তো আমরা সবাই জানি। অভিজিত বলে, হ্যাঁ লিলির মৃত্যুর সংবাদ। সন্ধ্যা বলে লিলি এভাবে চলে যাবে কোনদিন ভাবিনি। অভিজিত বলে, হ্যাঁ এ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগটা এরকমই। ডেভিড বলল, বিশাল সেদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল আমি বুঝতে পারিনি আর কাজের চাপে ওকে সময়ও দিতে পারিনি। হাসপাতালে নিতে নিতে লিলি মারা যায়। আজ যখন লিলির কথা মনে পড়ে আমার চোখের সামনে লিলির সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখতে পাই। আর লিলির সেই কথাগুলো আমার কানে বাজে, ডেভিডদা তোমাদের এলাকায় একবার যাব। তোমাদের এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করছে। অভিজিত বলল, আমি বাড়ী থেকে আসার সময় সুনীতি আমাকে বলেছিল আমিও তোমার সাথে যাব। ওকে সাথে আনতে পারিনি শুধু স্কুলের এই অনুষ্ঠানের জন্য। আমি জানি সুনীতি থ াকলে গানের রিহার্সেলটা চালিয়ে যেতে পারবে। সন্ধ্যা বলল, অভিজিতদা তুমি আর সুনীতি সাংস্কৃতিক চর্চায় পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দিলে। অভিজিত বলল, হ্যাঁ সেই ৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নিজেদের ক্লাব, ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান এমন কি ঢাকায় সুহৃদ সংঘের সাথে জড়িত ছিলাম দীর্ঘ দিন। তখনকার সময় আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যাত্রা, নাটক হতো। প্রায় সব জায়গা থেকেই আমার ডাক পড়তো কারণ নারী চরিত্রে তখন ছেলেরাই অভিনয় করতো। আমার জন্য থাকতো নায়িকার চরিত্র। তোমাদের আশীর্বাদে অনেক সুনাম অর্জন করেছি। তবে এর পিছনে সুনীতির অবদান ছিল অনেক। বড় বড় নাটক বা যাত্রাপালায় আমি বেশীরভাগ সময় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। রিহার্সেলের পর বাড়ীতে রিহার্সেল দিতাম। সুনীতি প্রমট্ করতো আমি অভিনয় করতাম। মাঝে মাঝে সুনীতি আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিতো। সন্ধ্যা বলল, সুনীতি কিন্তু তোমার চেয়ে কম কিছু নয়। সুনীতিকে চিনি আমি স্কুল লাইফ থেকে। দীর্ঘদিন আমরা গোল্লা সেন্ট থেক্লা হাইস্কুলে পড়াশুনা করেছি। একসঙ্গে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছি। সুনীতি ছিল ব্রিলিয়েন্ট ছাত্রী। পড়াশুনা, গান-বাজনা আর সংস্কৃতি চর্চায় ওর সমকক্ষ কেউ ছিলনা। ক্লাশ সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত ওই ছিল সারা স্কুলের মধ্যমনি। আমি শুধু ওর সব কাজে সাথী ছিলাম। ডেভিড বলল, সুনীতিকে যদি সঙ্গে আনতে তবে আজকের এই স্মৃতিচারণের আসরটা কতই না মধুর হতো। সন্ধ্যা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তারপর অভিজিতকে বলল, অভিজিতদা সুনীতিকে রেখে আসা তোমার ঠিক হয়নি। সন্ধ্যা আর ডেভিডের কথায় অভিজিত বলল, এখন বুঝতে পারছি সুনীতির উপস্থিতিটা এখানে কতটা প্রয়োজন ছিল। ডেভিড তুমি যখন আমাকে প্রথম ফোন করে জানালে বিশালের করোনা হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে তখন অন্য কিছু ভাবার অবকাশ আমার ছিল না। যা হউক লক ডাউন উঠে গেলে আমি সুনীতিকে নিয়ে আসবো এবং আমরা চারজনই চট্টগ্রাম যাব বিশালকে দেখতে। তাহলে আমি কাল সকালেই গ্রামের বাড়ীতে যাই। না অভিজিতদা কাল সকালে নয় পরশু সকালে যাবে। কিন্তু!! আর কোন কিন্তু নয় যদি চট্টগ্রাম যেতে তাহলে তো দু-তিন দিন সময় লেগেই যেতো। অগত্যা অভিজিত আর কোন কথা বলেনা। ডেভিড সন্ধ্যাকে বলল, আমাদের শোবার ব্যবস্থা কর রাত অনেক হয়েছে। সন্ধ্যা বলল, বিছানা প্রস্তুত আছে তোমরা এসো। সন্ধ্যা টেবিলের উপর থেকে দইয়ের খালি কাপ গুলো তোলে নিয়ে ভেতরে যায়। এমন সময় ডেভিডের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠে। ডেভিড মোবাইলটা হাতে নিয়ে হ্যালো বলতেই অন্যপ্রান্ত থেকে বলে উঠে বাবা আমি প্রশান্ত। কেমন আছিস বাবা? প্রশান্ত বলে আমরা ভাল আছি তোমরা কেমন আছ? মা কেমন আছে? আমরা সবাই ভাল আছি। তোর অভিজিত কাকু এসেছে আগামী কাল সকালে আমাদের চট্টগ্রাম যাবার কথাছিল তোর বিশাল কাকুকে দেখতে, ওর করোনা হয়েছে। লক ডাউনের কারণে আর যাওয়া হলোনা তাই ঘরে বসে তোর কাকুর সাথে গল্প করছি। প্রশান্ত বলল, বাবা করোনায় বাংলাদেশের অবস্থা কেমন? ডেভিড বলল, বাংলাদেশের অবস্থা খুব একটা ভাল না। তোরা কেমন আছিস? বৌমা, আমার দাদু ভাই, তোরা সবাই ভাল আছিসতো? আমরা মেরিল্যান্ড থাকি। এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ তবে এখানে এই দেশী লোকজনই বেশী আক্রান্ত হচ্ছে এবং মারাও যাচ্ছে। আমি যেখানে থাকি এখানে বাঙালি লোকজন কম। তবে আমরা এখনও ভাল আছি। বাবা তোমাদের ভিসার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে সামনের বড়দিনের পরই তুমি আর মা আমেরিকায় এসে পড়বে। প্রশান্তর কথা শুনে ডেভিড খুব চিন্তিত হয়ে পরে। ফোনে বলে, না বাবা প্রশান্ত আমরা কেউই আমেরিকায় যাবনা। তুমি বৌমা আর দাদুভাইকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আস। সবাই এক সাথে থাকবো। বাংলাদেশ এখনও আমেরিকার চেয়ে অনেক ভাল আছে। ডেভিডের কথা শুনে প্রশান্ত বলে, আমি এত চেষ্টা করে তোমাদের ভিসার ব্যবস্থা করলাম এখন তোমরা বলছ আসবেনা? ডেভিড আবার কিছু বলার আগেই ঘরের ভেতর থেকে সন্ধ্যা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাস করে, কে ফোন করেছে? কার সাথে কথা বলছ? ডেভিড বলে, প্রশান্তর সাথে। প্রশান্তের কথা শুনে সন্ধ্যা বলল, দাও দাও ফোনটা আমাকে দাও। বলেই ডেভিডের হাত থেকে ফোনটা নিয়ে ছেলের সাথে কথা বলতে বলতে ঘরের ভিতরে যায়। অভিজিত ডেভিডকে জিজ্ঞাস করে আমেরিকার অবস্থা তাহলে ভালনা। ডেভিড বলে প্রশান্তর কথায় তো তাই বুঝতে পারলাম। প্রশান্ত বলল, ওদের ওখানে নাকি বয়স্ক লোকই বেশী মারা যাচ্ছে। অভিজিত বলে তোমরা যে যাবে তোমরাও তো বয়স্কলোকের মধ্যে পড় তোমাদের তো ভয় আছে। ডেভিড বলল, আমি আমাদের জন্য ভাবিনা। আমি ভাবি ওদের জন্য। আমার একমাত্র সন্তান একমাত্র নাতি ওদের কিছু হয়ে গেলে আমাদের বেঁচে থেকে কি লাভ। তাহলে কি করবে এখন? তোমার ছেলেতো তোমাদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করেই ফেলেছে। ডেভিড বলে, তা হলেও আমাদের ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আমেরিকায় পাঠিয়েছি টাকা রোজগার করার জন্য নয়, উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে। এদেশে থাকলে আমার ভবিষৎ প্রজন্ম উচ্চশিক্ষা লাভ করা আর নৈতিক চরিত্র গঠন করতে পারবেনা, এই কারণে যখন আমেরিকা যাবার সুযোগ এলো আমি না করিনি। এই সুযোগে আমেরিকার মত একটা দেশ দেখার ভাগ্য হবে। কিন্তু আমেরিকার বর্তমান অবস্থা দেখে আমেরিকা যাবার কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে। তুমি ঠিকই বলেছ। অভিজিত বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ আমেরিকা, যারা রোবট তৈরী করেছে, চাঁদে গিয়েছে, মঙ্গল গ্রহে যাবার পরিকল্পনা করছে তারা কেভিড নাইনটিন এর ঔষধ আবিষ্কার করতে পারেনি। ডেভিড বলল, শুধু আমেরিকা কেন পৃথিবীর কোন দেশই পারেনি। বাজারে যে সব টিকা বেরিয়েছে তা তো করোনা নির্মূল করতে পারেনা। টিকা দিলে তোমার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। করোনার টিকা দেওয়ার পরও কতলোক করোনায় মারা যাচ্ছে সে খবর তো আমরা পাচ্ছি। অভিজিত বলল, গত পরশু রাতে টেলিভিশনে একটা খবর দেখলাম। খবরটা দেখার পর সুনীতি আর আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি দুজনেই পাথরের মত চুপ চাপ বসে ছিলাম। ডেভিড জিজ্ঞাসা করে, খবরটা কি? অভিজিত বলল, চট্টগ্রাম সরকারী এক হাসপাতালে একজন বৃদ্ধ